রঙের বিবি

বারীন্দ্রনাথ দাশ

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স ॥ কলিকাতা বারো ॥

প্রকাশক :
শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর :
সোমনাথ বন্দোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১৫-এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা—৯
প্রচ্ছদ-পট শিল্পী :
পূর্ণেন্দু পাত্রী
ব্লক ও প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ :
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
কলিকাতা—১২
বাঁধাই :
ওরিয়েন্ট বাইন্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা—৯

তিন টাকা

জ্যোতিপ্রসাদ বসু

বন্ধুবরেষু—

রচনাকাল

জুন থেকে আগস্ট, ১৯৫২

লেখকের আরেকটি বই

● কর্ণফুলি ●

শহরের যে পাড়ায় রুপালী সেনের যৌবন এলো সে পাড়ায় তাদের বসবাস তিন পুরুষের পুরোনো।

শেয়ালদার কাছাকাছি ফণী অধিকারী লেন বেরিয়েছে হ্যারিসন রোড থেকে। তারপর ঘুরে বেঁকে পেঁচিয়ে জিলিপির পাক খেয়ে নোনা ধরা পাঁচিলের ধার ঘেঁষে, ডাস্টবিন পেরিয়ে নর্দমা এড়িয়ে মিশে গেছে বৌ-বাজারের অলিগলির গোলকধাঁধায়। লেন বাইলেন ঘুরে পথ যেখানে নিরালা হয়ে এসেছে সেখানে ইজের পরা টিঙটিঙে ছেলেরা ফুটবল খেলে ন্যাকড়ার পুঁটলি দিয়ে, আর উপরের দোতলার জানলায় চুপচাপ বসে থাকে ডাগর-চোখ রঙ-ময়লা মেয়ে রুপালী।

তিন পুরুষের বাড়িতে ফাটল ধরেছে অনেকদিনই, প্লাস্টারের খোলস ভেঙে মুখ বার করেছে জীর্ণ ইঁটগুলো। ইঁটের পাঁজায় এখানে সেখানে তিন পুরুষের নিষ্ফল স্বপ্নগুলো মাকড়সার জাল আর কালির ঝুল হয়ে জমে আছে। জানলার বাইরে বহুদিন মেরামত না হওয়া খোয়া ছড়ানো পথ। কোনো এক অতীত কালে সে পথে যখন দইওয়ালার হাঁকে ভোর হওয়া দিন ঝলমল করতো সাদা চূণকাম করা বাড়িগুলোর পাঁচিল টপকে পথে নেমে আসা সোনালী রোদ্দুরে, টমটম হাঁকিয়ে রোগী দেখতে বেরুতেন রুপালীর ঠাকুর্দা শ্যামাকান্ত কোবরেজ। আজ সে পথে যখন সন্ধ্যা নামে গ্যাসবাতির মিটমিটে শিখায়, মন্থর পদক্ষেপে অফিস থেকে ফেরেন রুপালীর বাবা মার্চেন্ট অফিসের কেরানী উমাকান্ত সেন।

একতলায় যেখানে ছিলো শ্যামাকান্ত কোবরেজের বৈঠকখানা, এখন সেখানে এক এল-এম-এফ ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারি। বেশ পশার ডাক্তার মিত্তিরের, পাড়ার মাতব্বর, সম্প্রতি কর্পোরেশানের কাউন্সিলার হবার তোড়-

জোড় করছে। সন্ধ্যের পর সেখানে প্রত্যেকদিন আড্ডা বসে পাড়ার অন্যান্য মাতব্বরদের। ডাক্তার মিত্তির বহুকালের ভাড়াটে। ভাড়ার অঙ্কটা খুবই কম, সে টাকায় বিশেষ কোনো সুরাহা হয় না অভাবের সংসারে। তুলে দেওয়া যায় না, বরং ডাক্তারই উল্টো তম্বি করে। সম্প্রতি ডাক্তার-খানায় নিওন লাগিয়েছে, কিন্তু দশ টাকা ভাড়া বাড়িয়ে দিতে রাজী হয়নি।

উমাকান্ত সেদিকে ফিরেও তাকান না।

বাড়ির অবস্থা পড়ে যাওয়ার পর লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। এ পাড়ার প্রতিবেশী, ভিন পাড়ার স্বচ্ছল আত্মীয় স্বজন, প্রাক্তন সুদিনের চেনাজানা কারো সঙ্গেই মেশেন না অনেক বছর ধরেই। ছেলে মেয়েরা নতুন মেলামেশার বীজ বুনছে নিজেদের সমান অবস্থার নতুন পরিচিতদের মধ্যে। কিন্তু উমাকান্ত নিজেকে তফাতে রেখেছেন সব সময়। শ্যামাকান্ত সেনের ছেলে যে মার্চেন্ট অফিসের কেরানী আর মোড়ের কাশীনাথ ময়রার ছেলে হাইকোর্টের ব্যারিস্টার, এ পরিবর্তনের সঙ্গে নিজের মনকে আজো খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি।

ওধারে বাপের নামে একটি সরু রাস্তা আছে—শ্যামাকান্ত সেন লেন। একসময় তাই নিয়ে গর্ব করতেন, অফিসে নতুন কেউ এলেই গল্প করে শোনা-তেন। আড়ালে অন্য কেরানীরা ঠাট্টা করতো, শ্যামাকান্ত লেনের ছেলে উমাকান্ত বাই-লেন। একদিন কথাটা কানে এলো। সেদিন থেকে শ্যামাকান্ত সেন লেনের নাম মুখেও আনেন নি। অফিসে গিয়ে মুখ বুজে নিজের কাজ করে গেছেন। কাজ সেরে ধোঁয়াটে কলকাতা-সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছেন, পাড়ার মাতব্বরদের বিদগ্ধ কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠা ডিস্‌পেন-সারির পাশের প্যাসেজ দিয়ে চুপচাপ ঢুকে গেছেন বাড়ির ভিতর।

এমনি করে দিনের পর দিন।

একতলার রান্নাঘর থেকে ভেসে আসে চুড়ি-ঠুন-ঠুন খুন্তি নাড়ার আওয়াজ। সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে উঠে আসেন দোতলায়। মেজো মেয়ে বা ছোটো মেয়ে এসে জুতোর ফিতে খুলে দেয়। আজো নিজের জুতো নিজের হাতে খুলতে পারেন না মার্চেন্ট অফিসের কেরানী উমাকান্ত সেন।

বারান্দার এককোণে জলের ঘটি আর গামছা সাজানো থাকে। জুতো খুলে হাত মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে এসে বাপের আমলের একটি নারকোলের-ছিবড়ে-বেরিয়ে-পড়া গদি-আঁটা চেয়ারে বসে পড়েন। পাশে একটি ছোটো টেবিলে ঢাকা দেওয়া থাকে পাতি নেবুর শরবত। অন্য পাশে গড়গড়া।

একটু একটু করে নেবুর শরবত শেষ হয়ে আসে। গড়গড়ার নীল ধোঁয়ার ঝাপসা প্রতিবিম্ব পড়ে সামনের দেওয়ালের গিলটি করা ফ্রেমের দীর্ঘ আয়নায়। চানাচুরওয়ালা গান গেয়ে যায় বাইরের পথ বেয়ে।

কখন যেন দরজায় এসে দাঁড়ায় মেজো মেয়ে শ্যামলী। ফরসা তার রঙ, কাজল টানা চোখ।

—তোমার আর কিছু চাই বাবা?

চোখ বুঁজে ঘাড় নাড়েন উমাকান্ত।

শ্যামলী চলে যায়।

কি আর চাইবো পাগলি, যা' চাই তুই কি দিতে পারবি? আগের দিনগুলো ফিরে চাই, এনে দে' দিকিন।

উমাকান্ত গড়াগড়া টানতে টানতে নিজের মনে হাসেন।

সেই কবেকার দিনগুলো—যখন ঠিক এ সময় নীচের বৈঠকখানায় তর্ক চলছে শ্যামাকান্ত কোবরেজ আর সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত দুর্গাচরণ কাব্যরত্নের মধ্যে, এ ঘরে বাচ্চা উমাকান্তকে ভূগোলের পাঠ দিতে দিতে ঘুমে ঢুলতে শুরু করেছে রাখাল মাস্টার, একতলার রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে ইলিশমাছ ভাজার গন্ধ।

তারপর— ?

তারপর কখন যেন পেটেণ্ট কোবরেজি ওষুধের কারবার করতে গিয়ে লোহিত বর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করলেন শ্যামাকান্ত কোবরেজ। দেশের জমি-জমা সম্পত্তি সব কিছু গেল, দেনা হোলো, তারপর দেনা মেটাতে গিয়ে বাড়ি বাঁধা পড়লো।

উমাকান্তকে পড়তে দেওয়া হয়েছিলো মেডিকেল স্কুলে।

তখন পাড়ায় কী খাতির! সবাই ডাকতো খোকা ডাক্তার বলে। খোকা দা'কে না হলে দুর্গাপূজোর থিয়েটার হয় না, সরস্বতী পূজোর জলসা হয় না, তারিণী দত্তের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া হয় না—।

কিন্তু ডাক্তার হওয়া আর হোলো না। ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেণ্ড-ইয়ারেই ওঠা হোলো না কিছুতেই। ফিজিঅলজির খাতায় প্যাচার মুখ আর নীচে অধ্যাপকের নাম দেখে নম্বর দিলে না পাষণ্ড একজামিনার। মেডিকেল স্কুল ছাড়তে হোলো।

তারপর— ?

তারপর কোবরেজ বাপ মনের দুঃখ মনে চেপে ছেলের বিয়ে দিলে। ঘরে এলো রাঙা টুকটুকে বৌ। উলু দিলে, শাঁখ বাজালে আশেপাশের বাড়ির বৌ-ঝিয়েরা। নেমন্তন্ন খেলো পাড়াপড়শী আত্মীয় স্বজন।

বৌয়ের হাতে বাড়ির শ্রী ফিরলো, কিন্তু অবস্থা ফিরলো না।

চোখ বুঁজলো শ্যামাকান্ত কোবরেজ।

উমাকান্ত সেন ঢুকে পড়লো এক মার্চেণ্ট অফিসের অন্ধকূপে—।

তবু সেই আগেকার দিন,—যখন অল্প আয়ের মধ্যেও সংসার চলে যেতো। মাসের প্রথম দশ পোনেরো দিন অফিস ফেরত জলখাবার পাওয়া

খেতো ফুলকো লুচি, পটল ভাজা। যখন পাঁচ টাকা মণ চাল, ত্ব'টাকা সের ঘি, দশ আনা সের ইলিশ মাছ।

ছেলেমেয়েরাও খুব ছোটো। কোনো খরচা নেই।

এখন ছোটো মেয়ে রুপালীই বড়ো হয়ে গেছে, অনেক বড়ো হয়ে গেছে। রুপালীর মা নীরজা বলছেন, বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। ছেলে দেখ। সবে আই-এ পাশ করেছে রুপালী।

"এত তাড়াতাড়ি কী বিয়ে দেবে," বলেছিলেন উমাকান্ত।

"ওর পিসীদের কোন বয়েসে বিয়ে হয়েছিলো?"

"সেকাল আর একালে অনেক তফাত নীরজা। ওরা স্কুলে কলেজে পড়েনি। গাড়ি ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোয়নি।"

"হ্যাঁ, তা'তো বটেই, ওরা কার মেয়ে আর এরা কার মেয়ে সেটা ভেবে দেখতে হবে তো," খোঁটা দিতেন নীরজা। "কিন্তু তোমার মেয়ে গাড়ি ছাড়াই বাইরে বেরোয় বলে কি ওর বিয়ে থা দিতে হবে না?"

"আরো কিছুদিন পড়াশুনো করুক। ওর দিদিরা গ্র্যাজুয়েট, ভাই এম-এ। ও বি-এ' টা অন্তত করবে না?"

"বি-এ পাশ করে কি হবে শুনি?"

"নিজেও ত্ব'পয়সা রোজগার করতে পারবে তো—!"

"শ্যামলী কি রোজগার করছে দেখছি, রজতও কি করলো দেখলাম। বড়ো মেয়ের কাণ্ডকারখানা না হয় নাই বললাম। থাক বাবা, মেয়ের রোজগারে তুমিও খাবে না, আমিও খাবো না। দেখেশুনে একটা বিয়ে দিয়ে দাও।"

আস্তে আস্তে আসল সমস্যার উল্লেখ করতেন উমাকান্ত।

"কি দিয়ে দোবো?"

নীরজা চুপ করে থাকতেন অনেকক্ষণ। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে

বলতেন, "মেয়েদের পড়তে দিয়ে যদি পয়সা নষ্ট না করতে, তা'হলে বাড়িটা অন্তত ছাড়িয়ে নেওয়া যেতো এদ্দিনে। তারপর বাড়ি বাঁধা দিয়ে কি তিনটে মেয়ের বিয়ের খরচ জুটতো না ?"

"আবার বাঁধা দিয়ে !" ম্লান হাসতেন উমাকান্ত।

বাঁধা দেওয়া বাড়িটা ছাড়িয়ে নেওয়ার কোনো চেষ্টাই কোনোদিন করেন নি। শুধু সুদ গুনে দিতেন তিন মাস অন্তর। অন্য কোনো পাওনাদার হলে বাড়ি হাতছাড়া হয়ে যেতো এদ্দিনে। কিন্তু বাড়ি যাঁর কাছে বাঁধা দেওয়া হয়েছিলো তিনি উমাকান্তর পিতৃবন্ধু, যাঁর স্ত্রীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন শ্যামাকান্ত কোবরেজ। তাই তিনি টাকা ফেরত পাওয়ার আশা ছেড়ে দিলেও বাড়ি দখল করে উমাকান্তকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করেন নি।

—সুদ গুনে গুনে তো আসলের চাইতেও বেশি দেওয়া হয়ে গেল। এ টাকায় যে আরেকটি বাড়ি হোতো !

—বোঝো না কেন নীরজা। এ বাড়ি আমি আর ছাড়িয়ে নিতে পারবো না। সুদ দিয়ে যদ্দিন চলে চলুক। ভাড়াটে বাড়িতে থাকলে তো অনেক বেশী টাকা দিতে হোতো। কি আর হবে এ বাড়ির উপর মায়া করে। পুরোনো বাড়ি, আশেপাশে বাড়ি উঠে আলো হাওয়া তো বন্ধই হতে বসেছে। যদ্দিন এভাবে থাকা যায় থাকবো। যেদিন তুলে দেয় উঠে যাবো। বাড়ি মরগেজ হলেও কি আসে যায়, কলকাতা শহরে নিজের একটি বাড়ি আছে একথা তো সবাইকে বলা যায়। ছেলেমেয়েরা মানুষ হোক, যদি অবস্থা ফেরে, অন্য কোথাও গিয়ে নতুন বাড়ি করে থাকা যাবে।

—তিন পুরুষের বাড়ি, তোমার কোনো মমতা নেই এর উপর ?

—দেশের গাঁয়ে সাতপুরুষের ভিটে বেহাত হয়ে গেল, আর এতো শুধু তিন পুরুষের গোয়াল ঘর।

উমাকান্তর হাসি পায় রজতের কথাগুলো মনে পড়লেই।

মায়ের আক্ষেপ শুনে সে একদিন বলেছিলো,—পূর্বপুরুষ বসবাস করেছে বলেই যদি মায়া করে পড়ে থাকতে হয়, তা'হলে ফণী অধিকারী লেনের তিনের-দুই বাড়িটি কেন, ক্যাস্পিয়ান সী'র ধারে প্রাচীন আর্য পূর্বপুরুষদের ভিটেইতো ছিলো অনেক ভালো, অনেক বেশী স্বাস্থ্যকর। আর সেখানেই বা কেন, বানর পূর্বপুরুষদের গাছের ডালটি আঁকড়ে পড়ে থাকলেই হয়।

"তোর অন্তত তাই করা উচিত ছিলো"—ক্ষেপে উঠেছিলেন নীরজা—"এখন পর্যন্ত একটি চাকরি যোগাড় করতে পারলি না……"

বেচারা রজত !—নাক দিয়ে তামাকের ধোঁয়া আর হতাশার দীর্ঘ-নিঃশ্বাস দুটো একসঙ্গেই ছাড়েন উমাকান্ত।—চাকরি নিয়ে খোঁটা দিলেই ছেলেটি একেবারে দমে যায়।

রুপালী যাচ্ছিলো ঘরের পাশ দিয়ে।

উমাকান্ত ডাকলেন।

—আমায় ডাকছো ?

রুপালী ঘরে ঢুকলো। নাক মুখ ঠোঁটের বিচারে দেখতে অতো ভালো নয় ওর দিদিদের মতো। মুখ জুড়ে শুধু বড়ো বড়ো দুটো চোখ, শ্রাবণ মেঘের ছায়া নেমে আসা দীঘির মতো গভীর, শান্ত, স্তব্ধ।

—আমায় ডাকছো ?

—হ্যাঁ। আয়, বোস এখানে।

গড়গড়ায় দুটো দীর্ঘ টান। রাস্তা দিয়ে একটি রিক্শ চলে গেল ঘণ্টি ঠুন ঠুন করে।

—আই-এ তো পাশ করলি। বি-এ পড়বি যদি বল। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ঘাড় নাড়লো রুপালী।

—না বাবা, আমি আর পড়বো না।

—পড়বি না কি রে? তোর দিদিরা সবাই গ্র্যাজুয়েট—!

—মা বলছিলেন পড়ে আর কি হবে। মিছিমিছি পয়সা নষ্ট।

—ও।

চোখ বুজে গড়গড়া টানতে লাগলেন উমাকান্ত। পাশের বাড়ির রেডিওটা খুব জোরে ছেড়ে দিয়েছে। ছায়ানটে খেয়াল গাইছে একটি তৈরী-গলা মেয়ে।

রুপালী উঠে চলে গেল।

আগেও কবে যেন একথা শুনেছিলেন নীরজার মুখে—পয়সা নষ্ট!

—পয়সা নষ্ট হওয়া কাকে বলে নীরজা?

—যে খরচা না করলে চলে, সে খরচা মানেই পয়সা নষ্ট।

কথাটা উঠেছিলো বড়ো মেয়ে দীপালীকে নিয়ে। বি-এ পাশ মেয়ে, ইংরেজিতে অনার্স।

—দেখ নীরজা, আমি কোনো কিছু পাশ করিনি। আমার মেয়ে করেছে। এর জন্যে যে খরচা তাকে আমি পয়সা নষ্ট বলে মনে করি না।

—তা' করবে কেন? তুমি বড়লোকের ছেলে, আমি গরীব বিধবার মেয়ে, বেশী পয়সা কোনোদিন চোখে দেখিনি। মেয়েকে বি-এ পাশ না করালে কীই বা ক্ষতি ছিলো। মেয়ে আমার পরমা সুন্দরী, বেশ ভালো বরই জুটতো।

—যাকে জুটিয়েছে, সেই বা খারাপ কিসে?

—ওর নাম আর কোরো না। বিয়ে একটা করলে আমাদের মুখে চুণকালি দিয়ে। ওর ফিরিঙ্গীয়ানার জন্যে সবার কাছে আমার মাথা খাটো হোলো।

মনে পড়লে উমাকান্তর একটু দুঃখই হয় নীরজার জন্যে।

দীপালী বি-এ পাশ করে যখন রেডিওতে চাকরি নিলো, নীরজা আপত্তি করেছিলেন তখনই। কিন্তু উমাকান্ত খুব খুশী হয়েই দীপালীকে চাকরি করতে পাঠালেন। অভাবের সংসার, যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতিতে বিপর্যস্ত, রজত তখন এম-এ পড়ছে, মেয়ের আয় করা টাকা হলেও টাকার অনেক দাম।

কিন্তু রেডিওতে চাকরি করতে করতে দীপালী আস্তে আস্তে ভিড়ে গেল সমাজের আরেক প্রান্তে, অন্য ধরনের এক জনতায়। তার হাবভাব বদলে গেল, বেশভূষার ধরন বদলে গেল, কথাবার্তা চালচলন বদলে গেল।

একদিন বাড়ি ফিরলো চুল পার্ম করে।

রাগের মাথায় চুল ছিঁড়তে গিয়ে নীরজার চুলও প্রায় বব হয়ে যায় আর কি।

তারপর একদিন দেখা গেল দীপালীর ব্লাউস খাটো হয়ে গেছে তিন ইঞ্চি, গলা নেমে গেছে, পিঠ উন্মুক্ত হয়ে গেছে, জামাটি রবারের মতো লেপ্টে গেছে গায়ের সঙ্গে, স্বচ্ছতা ভেদ করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে উদ্ধত অন্তর্বাস। ঠোঁট জুড়ে ওষ্ঠরাগের রক্তরেখা, নখের রঙের সঙ্গে রঙ-মেলানো।

পথে বেরুতেই এবাড়ি ও বাড়ির বারান্দায় ভিড় হোলো। কে যেন সিটি মারলো ওধারের পানের দোকান থেকে।

—মেমসায়েবটি কে ভাই ? কি রকম করে শাড়ি পরেছে দেখনা।

—মেমসায়েব নয়রে। সেনেদের বাড়ির দীপালী।

—দীপালী ? আমাদের দীপু ?? ও—মা—!!!

নীরজার কান দুটো রাঙা হয়ে গেল মেয়ের নখের রঙের মতো।

কিন্তু মেয়ে কোনো কথা কানেই তুললো না।

—কেন এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে মন খারাপ করো ? বললেন উমাকান্ত। ছেলেমানুষ, ওসব এক আধটু করবেই। আজকাল সবাই করে। চাকরি করতে হয়, ওসব অল্পস্বল্প না থাকলে চলে না।

—ও চাকরি ছেড়ে দিতে বলো।

—চাকরি যদি ছেড়ে দেয়, একটি শাড়ি কিনতে চাইলে কিনে দিতে পারবে? একপদ গয়না গড়িয়ে দিতে পারবে? ও নিজের পয়সায় যা করবে করুক, ওকে মানা কোরো না।

—এদিকে লোকের কথা শুনে শুনে যে আমার মাথা কাটা যায়।

—মেয়েকে পেটভরে ছু'বেলা খাওয়াতে না পারলেও মাথা কাটা যায় নীরজা।

নীরজা মনে মনে যা ভয় করছিলেন, তাই হোলো। একদিন দেখা গেল দীপালী বিয়ে করে ফেলেছে রেডিওর এক কর্তাব্যক্তিকে, মা বাপের অনুমতির অপেক্ষা না করেই।

খুশীই হয়েছিলেন উমাকান্ত।

বেশ বড়ো ঘরের ছেলে।

—এর চেয়ে ভালো বর তুমি জোটাতে পারতে? গাঁটের পয়সা খরচা করে?

—তোমার পয়সা নেই, তার জন্যে আমায় খোঁটা দিচ্ছো কেন,—নীরজা চোখের জল মুছে বলেছিলেন আস্তে আস্তে।

উমাকান্তর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় নি।

নীরজা শুধু একদিন গিয়েছিলেন মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। ওদের উন্নাসিক ধরনধারন ভালো লাগেনি। কি রকম যেন একটা প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য, বিনীত অমায়িকতার আড়ালে, তা'তে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন নীরজা।

গতবছর জামাইষষ্টির দিন নেমন্তন্ন করা হয়েছিলো। জামাই আসতে পারেনি। সেদিন ওরা কাশ্মীর যাচ্ছে। টিকিট বুক করা হয়ে গেছে।

ছুটো আলাদা সমাজ, আলাদা পৃথিবী। কোনো মিল নেই এ তরফের জীবনযাত্রার সঙ্গে ও তরফের জীবনযাত্রার। আনাগোনা কমে গেল, আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এলো সমস্ত সম্পর্ক।

—দীপালী হাজার হোক মেয়ে। সে তো পর হবেই, উমাকান্ত সান্ত্বনা দিতেন নীরজাকে।

বি-এ পাশ করেছিলো মেজো মেয়ে শ্যামলীও।

কিন্তু দীপালীর মতো চটকদার কাজ শ্যামলীর জোটেনি। সে চাকরি করতে গেল একটি স্কুলে।

সামান্য মাইনে। বাপ তাইতেই খুশী।

নীরজাও আপত্তি করলেন না। এ যা' হোক ছেলেমেয়ে পড়ানো। আর সংসারেও টাকার দরকার।

কিন্তু নীরজাকে আবার বিচলিত হতে হোলো।

শ্যামলী একদিন বাড়ি ফিরলো একটি সুদর্শন ছেলের সঙ্গে। সেও নাকি কোন এক স্কুলের মাস্টার। শ্যামলী বললে, আমাদের অনেক দিনের পরিচয়; তোমাদের অনুমতি পেলে আমরা বিয়ে করে ফেলি।

নীরজা দ্বিতীয়বার কপালে করাঘাত করলেন।

কিন্তু বাপ রাজী হয়ে গেলেন খুব খুশী হয়ে।

তবু বিয়ে হোলো না।

ছেলের বাপ খবর পেয়ে ছেলেকে প্রচুর গালমন্দ করে বিয়ের ঠিক করে ফেললেন অন্যত্র। ছেলেটিও সুবোধ বালকের মতো বিয়ে করে ফেললো বাপের কথা মতো।

শ্যামলী আর বিয়ে করলো না। নীরজা ছেলে দেখছিলেন। শ্যামলী মানা করে দিলো।

রজতের ইতিহাস আরো সংক্ষিপ্ত।

এম-এ পাশ করবার পর বেকার বসে রইলো। দর্শন শাস্ত্রের একটি সাধারণ এম-এ'র কোনো চাহিদা নেই কোথাও।

সব দেখে শুনে তেতো হয়ে উঠলো নীরজার মন।

উমাকান্তকে প্রায় বলতেন—আমার খুড়তুতো বোন প্রমীলাকে দেখ। ওরও তিন মেয়ে, দুই ছেলে। মেয়ে তিনটি নামও সই করতে জানে না, কিন্তু কি রকম ভালো বিয়ে হয়েছে ওদের। ছেলে দুটি ম্যাট্রিক পাশ। একটি চাকরি করে টাটায়, আরেকটি ডিগবয়ে। ছোটোটির বিয়ে হোলো সেদিন। বেশ আছে ওরা—। আর আমি? দুটো গ্র্যাজুয়েট মেয়ে আর একটি এম-এ পাশ ছেলে নিয়ে আমার কি হোলো শুনি?

বেচারী নীরজা!—উমাকান্ত শেষ দুটো টান দিলেন গড়গড়ায়।—রান্নাঘরের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ওর মনে কালি পড়ে গেছে।

রুপালী চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো অন্ধকার জানলায়। ঘরের আলো জ্বালেনি ইচ্ছে করেই।

কাদের বাড়ির বাচ্চা মেয়ে সুর করে পড়ছে হাসিখুশির ছড়া। স্পষ্ট শোনা যায় এখান থেকে।

আর শোনা যায় দূর হ্যারিসন রোডে হুড়মুড় করে অনবরত ট্রাম চলে-যাওয়া একটার পর একটা, বাসের তীক্ষ্ণ হর্ণ আর চলতি জনতার দূরান্ত কোলাহল। এপাশের বাড়িতে সন্ধ্যেভর তাসের সহর্ষ আড্ডা। ও পাশের বাড়িতে ছোটো খোকার দুধ-না-খাওয়ার জিদ, খুকীটির গোলাপী রিবনের বায়না আর মায়ের বকুনি। আকাশে এক ঝাঁক চোখ-পিট-পিট তারা। ওধারের দোতলায় নতুন বিয়ে হওয়া স্বামী স্ত্রীর ছেলেমানুষি। নীচের তলার ডাক্তারখানায় রাজনৈতিক তর্ক। রাস্তা দিয়ে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গেল এক ঝাঁকড়া-চুল পশ্চিমা মুসলমান, তার সঙ্গে সরু গলা মিলিয়ে আর পায়ের ঝুমুর ঝুমঝুমিয়ে হেঁটে গেল সস্তা রেশমের ঘাগরা পরা একটি ছোটো মেয়ে।

সব মিলিয়ে বড়ো মাধুর্যময় মনে হোলো রুপালীর।

আমি কেন ওদের মধ্যে নেই—সে ভাবলো।

এমনি করে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, জীবনের চলতি মুহূর্ত-গুলি হাতছানি দিয়ে চলে গেছে জানলার পাশ দিয়ে।

রুপালী নিরুপায়ের মতো জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছে আর শুনেছে পাশের ঘরে উমাকান্তর গড়গড়ার কমতে কমতে ক্ষীণ হয়ে আসা আওয়াজ।

তারপর একটি অলস প্রশ্ন—ওরে, ভাতের আর কতো দেরি।

যেন আর দশটা কাজের মতো খাওয়াও একটি রুটিন বাঁধা কাজ,—সেরে ফেলতে পারলে ল্যাঠা চুকে যায়। উমাকান্তর যা কিছু ব্যাকুলতা সে শুধু বিছানার জন্যে, গড়িয়ে পড়ে চোখ দুটি একবার বুঁজতে পারলে আট-ন' ঘণ্টার মতো নিশ্চিন্ত।

উমাকান্তর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ব্যস্ততা শুধু শ্যামলীর। মায়ের কাজ সকাল বিকেল সন্ধ্যে একনাগাড়ে খেটে যাওয়া, আর একে বকুনি দেওয়া, ওকে বকুনি দেওয়া। শ্যামলীর কাজ মিষ্টি কথায় সবাইকে ভোলানো, ভাত বেড়ে দিয়ে সামনে বসে খাওয়ানো, বিছানার চাদর রিপু করে দেওয়া, বালিশের লংক্লথের ওয়াড়ে রঙিন সুতোর ফুল তোলা।

—ওরে, ভাতের আর কত দেরি? ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো যে!

শ্যামলীর সাড়া পাওয়া যায় রজতের ঘর থেকে: যাই বাবা, রজতের বিছানাটা করে দিয়ে আসছি।

তন্দ্রাতুর স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ নীরজার তীক্ষ্ণ গলা শোনা যায়: কাল রেশান তুলতে হবে, মনে আছে?

উমাকান্তর গলায় সারাদিনের ক্লান্তি: তাই নাকি? বেশ তুলে নিও। আমার হাতে টাকা নেই।

ওধারের দোতলায় নতুন বিয়ে হওয়া বৌটি ঘর থেকে পালাতে যায়।

আঁচল চেপে ধরে তার বর। রুপালী তাকিয়ে থাকে সেদিকে। তবু কানে আসে—

—শ্যামলীর কাছ থেকে নিয়ে নাও। ওকে বোলো আমি পরে দিয়ে দোবো······

—ওর হাতেও কিছু নেই·········

রাস্তা দিয়ে হার্মোনিয়াম বাজাতে বাজাতে ফিরে আসে সেই পশ্চিমা মুসলমান। তার সঙ্গে ঝুমুর-ঝুম-ঝুম মেয়েটি।.

—তা' হলে ?

পাশের বাড়ির তাসের আড্ডায় হৈ চৈ করে ওঠে ছেলেরা। কেউ ভুল তাস খেলেছে হয়তো।

—তা'হলে কি হবে সে কি আমি ভাববো ? তুমি আপিসে যাবে আর আসবে, তামাক টানবে আর বড়ো বড়ো কথা বলবে, ছেলেটি এক মিনিটও বাড়ি থাকবে না, যতো ল্যাঠা শুধু আমার······।

রেডিওতে অনুপমা হালদারের কীর্তন শেষ হোলো। এবার ইংরেজিতে খবর বলা আরম্ভ হবে।

—কেন বাবাকে এখন বিরক্ত করছো মা, শ্যামলীর চাপা গলা শোনা গেল, সারাদিন অফিসে খেটেখুটে ফিরেছেন······।

—আর আমি সারাদিন পায়ের উপর পা তুলে আরাম করছি, না ?

—থাক, এখন আর এসব আজে বাজে কথা বলে বাবার মন তেতো করে দিয়ো না······।

—কার মন কখন তেতো করে দেবো আমায় টাইম বেঁধে দে দিকিন। সকালে বলবি, ঘুম থেকে উঠেই এসব কথা, কাজে বেরুনোর আগে মেজাজ খিঁচড়ে দিলে। সন্ধ্যেবেলা বলবি, সারাদিন খেটে বাড়ি ফিরলো, এখন ওসব কথা বলে কেন মেজাজ তেতো করে দেওয়া। ছুটির দিনে শুনবো,

হপ্তায় তো একদিন ছুটি, তাও কেউ শান্তিতে থাকতে দেবে না। যতো অশান্তি যেন আমি সৃষ্টি করছি।

—বাবা, খেতে এসো। বেড়ালটিকে ওখান থেকে তাড়াওতো মা! এক্ষুনি পাতে মুখ দেবে……।

আকাশে চোখ পিট পিট করে যায় চুম্‌কি তারাগুলো। ইন্দোচীনে ফরাসী উপনিবেশনীতি আলোচনা করে ডাক্তারখানার লোকগুলো।

পরশু……—কাল……—আজ……—হয়তো কালও……। এমনি করেই সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত হবে, তারপর ভোর হবে রাত শেষ হয়ে।

যে যার মতো বেশ আছে, রুপালী ভাবলো। শুধু আমি কেন এদের সবার মধ্যে এত একা, এত নিঃসঙ্গ…… !

জানলার ওপারে কমলালেবুর মতো পৃথিবী লাট্টুর মতো ঘুরে ঘুরে যায় ডাইনে থেকে বাঁয়ে। ঘণ্টায় অসংখ্য হাজার মাইল তার গতি। জানলার এপারে জীবনের ঝড় ঝাপটায় টলমলো সংসার।

এরই মধ্যে ছোটো মেয়ে রুপালী বড়ো হয়ে উঠেছে মনের দিক থেকে একলা হয়ে। ছেলেবেলা থেকেই সরে সরে থাকতো অন্য সবার কাছ থেকে। সব সময় তার মনে হোতো: ওরা ফরসা, আমি কালো; ওরা বড়ো, আমি ছোটো। তার দিকে বেশী নজর দেওয়ার অবসরও কারো ছিলো না। দীপালী, শ্যামলী, রজতের দায়িত্ব সামলাতেই সংসার তখন নাজেহাল।

জানলার পাশেই ন্যাকড়ার পুতুলের সংসার নিয়ে তার শৈশব কেটে গেল। বাঁধন গড়ে উঠলো না কারো জন্যে, গড়ে উঠলো শুধু একটি ঘর-পালানো মন। মায়ের শেমিজের আর দাদার শার্টের আর দিদিদের ব্লাউসের কাটা টুকরোগুলো জুড়ে সেলাই করা ফ্রক পরে খালি পায়ে স্কুলে গেল সে। বাড়ি ফিরে চুলের উকুন বাছতে বাছতে স্বপ্ন দেখলো বড়ো

হয়ে মুখে পাউডার মাখবার। আরো বড়ো হয়ে, স্কুল-জীবন পেরিয়ে দু' আনা পয়সা রুমালে বেঁধে নিয়ে আজ এ দিদির শাড়ি কাল ওদিদির স্লিপার পরে তিন নম্বর বাসে চেপে বড়ো পাঁচিল ঘেরা মেয়ে কলেজে পড়তে গেল রুপালী, আর বিকেল বেলা বাড়ি ফিরে বঙ্কিমবাবু শরতবাবুর উপন্যাস পড়ে সুদূর বাড়িগুলোর খোলা জানলার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে বন্ধুতা পাতিয়ে গেল দিনের পর দিন।

এ সুখও সইলো না বেশীদিন। দীপালীর বিয়ে হয়ে গেল, শ্যামলীর হোলো না, রজত প্রায় বখে যায় যায়। এতদিন রুপালীকে নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামাননি নীরজা। এবার নিয়ে পড়লেন তাকে, সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখবার চেষ্টা করলেন তার বাপ ভাই বোনের আওতা থেকে। নাটক নভেল ঝেঁটিয়ে সাফ করা হোলো রুপালীর টেবিল থেকে। কলেজ বাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোলো আর্থিক অসুবিধে সত্ত্বেও। দেখতে পেলো না সিনেমা আর থিয়েটার, শিখতে পেলো না গান বাজনা আর শৌখিন সেলাই।

নীরজার বড়ো ভয়। কে জানে যদি সে মেমসায়েব হয়ে যায় দীপালীর মতো, কিম্বা যদি শ্যামলীর মতো আইবুড়ো থেকে যাওয়ার কারণ ঘটে যায়! পড়াশুনো করা নেহাত এবাড়ির রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তা' নইলে তাও বন্ধ হয়ে যেতো।

আই-এ' পরীক্ষার খবর যেদিন বেরুলো নীরজা রুপালীকে ডেকে বললেন,— ওরা যদি আরো পড়তে বলে, তা'হলে?

—পড়বো।

—না। বলে দিস যে আর পড়বি নে।

—কেন?

—তোর আর পড়তে ভালো লাগে না বলে।

—কিন্তু ভালো-লাগে যে!

—আমার এত অসুবিধের মধ্যে তোর পড়তে ভালো লাগে ?

—কি করবো তা'হলে ?

—সে ব্যবস্থা আমি করবো।

রুপালী আর কিছু বলেনি।

জানলার পাশে দাঁড়িয়ে রুপালীর আস্তে আস্তে মনে পড়লো সেই ছেলে-বেলার দিনগুলো,.........সারাদিন পুতুল নিয়ে খেলা আর খেলা আর খেলা। মাঝে মাঝে দীপালী কোলে বসিয়ে বই খুলে বলতো—পড়তো রুপু ঃ অজগর আসছে তেড়ে......!

—কোথায় অজগর ?

—ওই যে, মিত্তিরদের বাড়ির ছাতে চিলেকোঠার ওপাশে। পড়, নইলে এক্ষুনি তেড়ে আসবে।.........বেশ, তারপর ....আমটি আমি খাবো পেড়ে......।

—আমি আম খাবো না।

—কী জ্বালা! মেয়েটার মাথায় যদি একটুও বুদ্ধি থাকতো! আম খেতে তোকে কে বলছে! যাঃ, ওঠ এখান থেকে, আর পড়তে হবে না, ওঠ! ওঠ বলছি। ওমা, বলতে না বলতেই কান্না জুড়ে দিলো যে! রুপুকে নিয়ে আর পারি না বাবা।

গটমট করে দীপালীর প্রস্থান। শ্যামলীর নিঃশব্দ প্রবেশ, জানলা-গলে-আসা চৈত্র সন্ধ্যার এক ঝলক হাওয়ার মতো।

—কাঁদছিস রুপু! নে, আর কাঁদে না। কি এনেছি দ্যাখ্!

একফালি আমসত্ব শ্যামলীর হাতে। তাকের উপর থেকে চুরি করে আনা। চোখের জল পুঁছতে পুঁছতে রুপালীর ফিক ফিক হাসি।

—দিদিটা খুব দুষ্টু, না? খালি বকে। আমি খুব ভালো, না? আমার কাছে পড়তে রুপুর খুব ভালো লাগে, আমার কাছে রুপু গল্প শোনে, তাই না? আচ্ছা, আগে পড়া, না আগে গল্প? আগে পড়লে পাঁচ মিনিট পড়া,

তারপর গল্প। আগে গল্প শুনলে পাঁচ মিনিট গল্প, তারপর পড়া। তা'হলে গল্পটাই আগে বলি, কেমন ?

—না, আগে পড়া। পাঁচ মিনিট নয়, এক মিনিট······।

—আচ্ছা, এক মিনিট। বই কোথায় ? এইতো। আচ্ছা, অজগর······

—আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাবো পেড়ে। ব্যস, এক মিনিট হয়ে গেছে।

—ওমা, দেখছো কী দুষ্টু মেয়েটি! আচ্ছা, আজ আর পড়ে না, আজ শুধু গল্প, কেমন ?

শ্যামলীর কোলে রুপালীর উপবেশন।

—এক যে ছিলো রাজা। তার তিন রানী। তিন রানীর একটিরও ছেলে নেই। রাজা একদিন বললে·········

এমনিতরো দিদি শ্যামলী। আজো।

একটুও বদলায়নি।

রুপালী গিয়ে দিদিকে বললে, "মা যে আর পড়তে মানা করছে।"

শ্যামলী উত্তর দিলো, "কলেজে না হয় আর নাই গেলি। বি-এ'টা প্রাইভেট দিয়ে নিলেই হবে। আমি আছি, রজত আছে, দেখিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব কি ?"

"মা বোধ হয় এবার বিয়ে দিয়ে ফেলতে চান—।"

মেঘলা সন্ধ্যার মতো বিষণ্ণ রুপালীর মুখ। চোখে উৎকণ্ঠা। ঠোঁট-চাপা দৃঢ়তায় ঝড়ের মুখোমুখি হবার মানসিক প্রস্তুতি।

শুনে শ্যামলী একটু চুপ করে রইলো প্রথমটা। তারপর হেসে বললো, "দিয়ে দিলে দেবে। কি হয়েছে তা'তে ? ভালো বর পেলে বিয়ে করে ফেলাই ভালো। তবে ঠিক মতো ছেলে পেতে পেতে কদ্দিন লাগে দ্যাখ না। যা'র তা'র সঙ্গে ধরে বেঁধে দিয়ে দিলেই হোলো না কি ? সে জন্যে তুই ভাবিসনে। আমি তো আছি।"

শ্যামলী চলে যেতে রুপালী আবার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

কেউ কিছু করবে না তার জন্যে, রুপালীর মনে হয়েছিলো।

যা করবার আমাকেই করতে হবে, ভেবেছিলো সে। করতেই হবে যা হোক একটা কিছু। বড়দি'র মতো নয়, ছোড়দি'র মতো নয়, দাদার মতো নয়। আমার নিজের মতো—

এ বাড়িতে সুখ নেই। পালাতেই হবে এখান থেকে—। যে করেই হোক!

শ্যামলীকে একদিন বলেছিলো, "ছোড়দি, চলো আমরা পালিয়ে যাই—।"

শ্যামলী শুনে একটু হেসেছিলো। তারপর রুপালীর কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করেছিলো :

"কোথায় ?"

"অন্য কোথাও, সে যেখানেই হোক—"

"কেন রে ?" হেসে বলেছিলো শ্যামলী।

"এ সংসারে সুখ নেই—।"

শ্যামলী এক মিনিট কোনো কথা বলেনি। মনে হয়েছিলো তার চোখ দুটি যেন চিক চিক করে উঠলো একটুখানি।

তারপর আস্তে আস্তে বলেছিলো, "ওরে পাগলি, এ সংসারে আমরা সবাই যে একসঙ্গে আছি, তাই মস্তো সুখ।"

"কি ভাবছিস রে রুপু ?"

শ্যামলী এসে দাঁড়ালো জানলার কাছে। রুপালীর পাশে।

"রজতটার এখনো দেখা নেই।" শ্যামলী বলে চললো, "গাধাটা কোথায় যে যায়, কেন যে রাত করে ফেরে বুঝি না। বাড়ির মেয়েদের অনেক রাত অবধি বসিয়ে না রাখলে এদের যেন ভাত হজম হয় না।…ওই যে আসছেন শ্রীমান রজত।

একটু পরে রজত এসে ঘরে ঢুকলো।

"এত দেরি হোলো কেন রে?"

"দেরি? কতো কারণে হতে পারে। মনে করো একটি মেয়েরই প্রেমে পড়েছি।"

"নে, আর ইয়ার্কি মারতে হবে না। একটু সকাল করে ফিরলে কি হয় শুনি?"

"মেয়েটি যে বারোটা না বাজিয়ে উঠতে দিতে চায় না।"

"তোর বারোটা বাজাতে যে মেয়ের এত দেরি হয় তার মতো বোকা নিশ্চয়ই পৃথিবীতে আর নেই। ওর ধারে কাছে যাসনে। কাল থেকে আটটার মধ্যে ফেরা চাই।"

"ভাই ছোড়দি', ও মেয়ের কাছে বসলে ঘড়িও অচল হয়ে যায়, আমি তো এক তুচ্ছ মানুষ—।

"ব্যস, ব্যস, খুব হয়েছে। আর বাজে বকতে হবে না।"

"তুমিই তো জানতে চাইলে আমার কেন ফিরতে দেরি হোলো। একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছি, এ ছাড়া আর কোন্ কৈফিয়ত শুনলে তুমি চুপ করে থাকবে বলো—।"

"না, ভাই। আমি কৈফিয়ত চাইনি।"

"সত্যি কথা শুনবে? এক বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম—।"

"রজত, কোনোদিন রাত বারোটার আগে মায়ের আর আমার খাওয়া হয় না, জানিস? শুধু তোরই জন্যে। আমার না হয় কিছু আসে যায় না, কিন্তু মায়ের তো কষ্ট হয়—।"

"তোমরা খেয়ে নিলেই পারো। কতোদিন বলেছি আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দেবে।"

"সে হয় না।"

"কেন হয় না শুনি—?"

“সে কথা বোঝবার বুদ্ধি থাকলে তুই কোনোদিন এত দেরি করে ফিরতিস না।”

“বাঃ। অদ্ভুত যুক্তি! প্রতিপক্ষের বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেই কি নিজের বক্তব্য নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়?”

“খেতে আয়—।”

“কাল থেকে আমি রাত দুটোয় ফিরবো।”

“খেতে আয়—।”

“আমার ভাত কাল থেকে ঢাকা দিয়ে রাখবে।”

“খেতে আয়—।”

“আমার জন্যে না খেয়ে বসে থাকলে আমি খাবো না বলে দিচ্ছি।”

“সে দেখা যাবে। এখন খেতে আয়।”

শ্যামলী দরজার দিকে এগুলো।

পেছন পেছন রজত।

রূপালী দাঁড়িয়ে রইলো জানলার কাছে। নীচের ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। থেমে গেছে পাশের বাড়ির তাসের আড্ডার কোলাহল। ট্রেনের তীক্ষ্ণ বাঁশি শোনা গেল দূর শেয়ালদায়।

ও বাড়ির নতুন-বিয়ে-করে-আনা বৌটি তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলের কাঁটাগুলো খুলছে একটার পর একটা।

খাওয়াদাওয়া সেরে রজত ফিরে এলো তার নিজের ছোট্টো ঘরটিতে।

একটি তক্তাপোশ, পাশে একটি ছোটো টেবিল, একপাশে একটি শেলফ্-এ কয়েকটি বই—যার বেশির ভাগ পরের কাছ থেকে পড়তে চেয়ে এনে ফিরিয়ে না দেওয়া।

এতেই ঘর ঠাসাঠাসি। কোনো রকমে পা ছড়িয়ে বসা যায়।

ভাবলো, কি করি এখন? ঘুম তো আসছে না।

হাসি পেলো।

দিদিকে বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ার আসল কারণটাই বলেছিলো রজত। দিদি ভেবেছে ঠাট্টা করছে।

মেয়েটির নাম ডলি দেশরাজ। পাঞ্জাবী মেয়ে। রেফিউজি।

ডলি আগে থাকতো লাহোরে। তার বাপের নাকি সেখানে ছিলো বিরাট ব্যবসা আর আট দশখানা বাড়ি। উনিশশো সাত চল্লিশের দাঙ্গায় বাপ, ভাই, খুড়ো, বাড়ি, ব্যবসা সব কিছু খুইয়ে রেফিউজি হয়ে কলকাতায় এসে জুটেছে।

এ গল্প তো প্রায় সব পাঞ্জাবী রেফিউজির কাছেই শোনা যায়। দেশ-ভাগ হওয়ার আগে সবাই কোটিপতি, দাঙ্গার পর সবাই ফকির।

ডলির বোলচাল প্রায় কোটিপতির মতোই। সব সময় পরনে রেয়নের শাড়ি, বাঙ্গালোর সিল্কের চোলি, ঠোঁটে রং, চোখে বিলোল উদ্ধত কটাক্ষ। করে তো কোন এক রেফ্রিজারেশান কোম্পানিতে একশো পঁচিশ টাকা মাইনের রিসেপশানিস্টের চাকরি।

তবু ডলি মেয়েটি ভালো। কেউ নেই সংসারে। লাহোরের নৃশংস দাঙ্গার মধ্যে সে শুধু মাকে নিয়েই কোনোরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছিলো। লাহোর থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে কলকাতা। কলকাতায় এসে উপোস করতে হয়নি তাদের। ডলি অর্থ সাহায্য যোগাড় করেছিলো গভর্নমেণ্ট থেকে, তারপর ফিটফাট ঝকমকে হয়ে দিন চালানোর মতো একটি চাকরি যোগাড় করে নিয়েছে, যা রজত কলকাতায় তিনপুরুষের বাসিন্দা হয়ে পারেনি।

ডলি দেড়খানা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে পার্কসার্কাসে। আসবাবপত্তর সামান্যই তবু বাইরের ঘরখানি সস্তা পর্দায়, নিজের হাতে ফুলতোলা টেবিলক্লথ আর কুশনে, ফুলে আর ফুলদানিতে চমৎকার সাজানো।

ডলি দেশরাজ যে অফিসে চাকরি করতো সেখানে সেলস্‌ম্যান ছিলো রজতের বন্ধু কমলেশ। তাকে ডলি বলেছিলো সে বাংলা শিখবে, যদি কমলেশের চেনাশোনা কেউ থাকেতো বলতে। তবে সে খুব গরীব, পোনেরো টাকার বেশি দিতে পারবে না।

কমলেশ বলেছিলো রজতকে।

রজত এলো ডলির কাছে।

খুব খাতির যত্ন করলো ডলি। বেশ সহজ মেয়েটি। নিজের হাতে কফি তৈরি করে খাওয়ালো।

"শুধু কফি দিচ্ছি, কিছু মনে করবেন না," ঝরঝরে ইংরেজিতে ডলি বললে, "আমাদের আর আগের অবস্থা নেই। লাহোরে হলে আপনাকে খুব ভালো ভাবে আদর আপ্যায়ন করতে পারতাম। আমার বাবা ছিলেন হারুণ-অল-রশিদের মতোই। একা খেতে পারতেন না। প্রত্যেকদিন একজন না একজন কাউকে ডিনারে ডাকতেন। একদিন পাতিয়ালার মহারাজা আমাদের বাড়ি এলেন। বাড়িতে তখন মা'ও নেই, আমিও নেই— ।"

"মাপ করবেন, কফিতে চিনি একটু কম হয়েছে মনে হচ্ছে— ।"

চিনির বাটি এগিয়ে দিলো ডলি দেশরাজ।

"আমায় সপ্তায় ক'দিন আসতে হবে ?"

"শুধু দু'দিন। বুধবার, শনিবার। অফিসে এত কাজ! ছ'টার আগে বাড়ি ফিরতে পারি না। আগের দিনে হ'লে আপনাকে সাতদিনই আসতে বলতাম।—তবে হ্যাঁ, শনিবার রোববার বলতে পারতাম না। ও দু'দিন বাড়িতে থাকতামই না। এ বেলা এখানে লাঞ্চ্‌, ওখানে টী, অন্য কোথাও ডিনার। পার্টি কোথাও না কোথাও লেগেই থাকতো। প্রায় রোববার পিকনিকে যেতাম। অবশ্যি কোনোদিনই সন্ধ্যেবেলা আপনাকে আসতে বলতে পারতাম না। আপনাকে আসতে হোতো সকাল বেলা।

প্রত্যেকদিন টেনিস খেলতাম কিনা। দু'দু'বার মেয়েদের সিঙ্গ্‌ল্‌স্‌এ চ্যাম্পিয়ানশিপ পেয়েছি। প্রায়ই তো গভর্নমেণ্ট হাউসে খেলতে যেতাম। হিস্‌ এক্সিলেন্সি আমায় এত ভালোবাসতেন! বাবাকে কতোবার বলেছেন, তোমার মেয়েকে আরেকটু কোচ করিয়ে উইম্‌ব্‌ল্‌ডনে পাঠিয়ে দাও—।"

"তা'হলে সপ্তায় দু'দিন—বুধবার আর শনিবার?"

"হ্যাঁ। মিস্টার দত্ত আপনাকে নিশ্চয়ই বলেছেন, আমাদের এখন খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। আপনাকে পোনেরো টাকার বেশি দিতে পারবো না। আর,—আর হ্যাঁ, আপনাকে রাখবো মোটে তিন মাস।"

"তিন মাস?"

"হ্যাঁ, তিন মাসের মধ্যে আমায় বাংলা শিখিয়ে দিতে হবে।"

"তিন মাসের মধ্যে কি করে হবে?"

"সে আপনি বুঝবেন। আমি বাংলা জানি একথা বলে বেড়ানোর মতো বাংলা শিখিয়ে দিলেই চলবে।"

"কিন্তু এত তাড়া কিসের?"

"বলবো আপনাকে? কাউকে বলবেন না, প্রমিস্‌? আমার বাবার একজন বন্ধু এখানকার একজন মিনিস্টারকে আমার কথা বলেছেন। উনি জানিয়েছেন আমি যদি ভালো বাংলা শিখে নিতে পারি দু'তিন মাসের মধ্যে, তা'হলে এখানকার রেফিউজি রিহাবিলিটেশানে একটি ভালো চাকরি পাইয়ে দেবেন।"

"ও," রজতের মেজাজ একটু তেতো হোলো।

"প্রায় সাড়ে তিনশো টাকার মতো মাইনে—।"

"তাই নাকি—!" ফাঁপা কলসির মতো আওয়াজ বেরুলো রজতের মুখ থেকে।

"জানেন মিস্টার সেন, আমি প্রথম যখন বি-এ পাশ করলাম, আমার টাটার

কর্তৃপক্ষ সাড়ে সাতশো টাকা মাইনেতে ওয়েলফেয়ার অফিসারের চাকরি অফার করলে। ওঁদের একজন ডিরেক্টার আমার বাবার খুব চেনা। আমার কাকা আর উনি একসঙ্গে ফ্লাইং শিখেছিলেন। তিনি আমায় বলতেন, তোমার মতো স্মার্ট আর এ্যাকটিভ মেয়ে আমাদের চাই। তা নইলে ইণ্ডিয়ার ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ডিভেলাপমেণ্ট হবে কি করে? তুমি এসো, আমরা তোমায় বিলেত থেকে ট্রেন্ করিয়ে আনবো। কিন্তু সে সময় আমাদের অন্যরকম ব্যাপার। বাবা বললেন, আমার মেয়ে হয়ে তুমি সামান্য সাড়ে সাতশো টাকা মাইনের চাকরি করতে যাবে!"

রজত উঠে পড়লো।

একমাস কেটে গেল। রজত বাংলা পড়ালো ডলিকে।

মাইনের টাকাটা দশ তারিখের মধ্যেও পাওয়া গেল না।

মাসের বারো তারিখ ডলি নিজের থেকে বললে, "দেখুন, এ মাসে আমার অনেক টাকা খরচা হয়ে গেছে। সেদিন স্যর নকুল সিংএর বৌ আর মেয়ে দেখা করতে এলেন আমরা এখানে আছি শুনে। আগের মতো আর এণ্টারটেন করতে পারলাম না, তবু চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার মতো খরচা হয়ে গেল। ওর মেয়ে রাজিন্দার বললে, ডলি, এত বছর পরে দেখা, কই তোমার বয়েস একটুও বেড়েছে বলে মনে হয় না, তুমি এখনো ঠিক আগের মতো এত সুন্দর দেখতে! ও নিশ্চয়ই আমাকে খুশী করবার জন্যে বলেছে। আমি তো আর আগের মতো চেহারার যত্ন নিই না। তখন আমার যা চেহারা ছিলো, শোরাব মোদী, ওই যে নাম করা ডিরেক্টার, সে কতোবার বাবাকে বলেছে—থাক ওসব কথা। এই যে শাড়ি পরেছি দেখছেন, আগে এসব শাড়ি আমাদের ঝিয়েদের পরতে দিতাম।"

মোদ্দা কথাটা মাইনে এ মাসেও পাওয়া যাবে না। রজত শুনে একটু হাসলো, হেসে ভাবলো, বাঃ বেশ তো মেয়েটি। একটু বেশী কথা বলে, তা

নইলে মনটা ভালো। এই একমাস ধরে সে দেখছে কী ভীষণ খাটে মেয়েটি। অফিস করে, রান্নাবান্না করে, তারই মধ্যে বাংলা পড়ে, সপ্তায় দু'দিন এলিয়ঁাস্ ফ্রাঁসে'তে গিয়ে ফ্রেঞ্চ পড়ে। মা'কে কোনো কাজ করতে দেয় না, সব কাজ নিজে করে। রজত এলে তা'কে কফি নয় তো কোকো, নয় তো বা শরবত, কিছু না কিছু খাওয়াবেই।

আর নিজেদের দৈন্য ঢাকবার কি ব্যাকুল প্রয়াস—ঝলমলো জামা-কাপড়ে, ঝলমলো কথাবার্তায়।

"আচ্ছা, এক কাজ করা যাক," রজত বললে।

ডলি তাকালো তার দিকে।

"আপনি আমায় হিন্দি শেখান, আমি আপনাকে বাংলা শেখাই। আমি সপ্তায় চারদিন করে আসবো। আপনি দু'দিন হিন্দি পড়াবেন, আমি দু'দিন বাংলা পড়াবো।"

ডলি একটু ভাবলো। বললো, "কিন্তু টাকাটা তো আপনার দরকার।"

"কিচ্ছু না। কমলেশ বলেছে বলেই আমি এসেছিলাম। তা'নইলে আমার সময় কোথায়?"

"আপনি কি করেন আমায় তো বলেননি একদিনও।"

"আমি?" রজত এক সেকেণ্ড ভাবলো, "আমি একটি কলেজে ফিলসফি পড়াই।"

"আপনি? আপনি কলেজের প্রফেসার? আমায় আগে বলেন নি কেন? আমি কোনোদিন আপনাকে পোনেরো টাকা মাইনে দিয়ে রাখতে সাহস করতাম না। আপনি কী ভাবলেন আমার সম্বন্ধে—!"

"কিচ্ছু না। এর মধ্যে তো টাকার প্রশ্ন আসছে না। আপনি আমায় হিন্দি পড়াচ্ছেন, আমি আপনাকে বাংলা পড়াচ্ছি।"

ডলি রাজী হয়ে গেল খুব খুশী হয়েই।

"জানেন, এক সময় আমায় পড়ানোর জন্যে চারজন প্রফেসার রাখা

হয়েছিলো। একজন ইংলিশ, একজন লজিক, একজন ইকনমিক্স, একজন হিস্ট্রি—।”......

তিন মাস পেরিয়ে ছ'মাস হয়ে গেল। ডলি দেশরাজ বাংলা শিখে নিলো কাজ চালানোর মতো কিন্তু সরকারী চাকরি তার হোলো না। যে ফার্মে কাজ করতো সেখানেই থেকে গেল একটি ইনক্রিমেণ্ট নিয়ে।

রজত হিন্দি শিখলো না এক অক্ষরও। সে ডলির বাড়ি যাওয়া আসা করতে লাগলো নিয়মিত।

সেদিন ডলির ওখানে গিয়ে রজত দেখে সে বেরুচ্ছে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে। দিন দুই পরে আসবে বলে রজত চলে এলো।

তারপর বাড়ি ফিরে দেখে আর ঘুম আসে না। সে দিনও না, তারপর দিনও না—।

এ তো ভালো কথা নয়, রজত ভাবলো।

তারপর আজ সন্ধ্যে বেলা ডলিকে গিয়ে বললো, “দেখ, তুমি তো বেশ বাংলা শিখে গেছ। আমার তো আর আসার দরকার নেই।”

“কেন, তুমি তো হিন্দি এখনো শেখোনি!”

“সে আমি শিখতে পারবোও না,” বললে রজত।

“তুমি আর আসবে না?” ডলি জিজ্ঞেস করলো চোখ তুলে।

“আসবো না কেন? মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই আসবো।”

ডলি হাসলো। তারপর বললে, “কফি তো ফুরিয়ে গেছে। ফেরবার সময় কিনে আনতে মনে ছিলো না। তোমায় দুধ দেবো এক কাপ?”

“দুধ? না, আমি দুধ খাই না।”

“বাংলায়? তোমায় বলিনি আমার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতে? তা' না হলে হিন্দি শিখবে কি করে? হিন্দিতে বলো।”

"হাম ত্বধ নেহি খাতা হায়।"

ডলি হেসে খুন। ত্বধ খাতা আবার কি? "বলো, হ্যম ত্বধ ন্যহি পিতে হঁ্যায়।"

"ও আমার হবে না।"

"তা হলে ত্বধ খেতে হবে।"

"উঁ হুঁ।"

"সে হবে না। হয় হিন্দিতে কথা বলো, নয় তো ত্বধ খাও।"

"ত্বধ খাওয়ানোর ভয় দেখিয়ে রাষ্ট্রভাষা শেখাবে, এ'তো মন্দ প্ল্যান নয়।"

"হিন্দিও শেখাবো, ত্বধও খাওয়াবো।"

রজত হাসলো। "তুমিও আরম্ভ করলে? ছেলেবেলায় ত্বধ খাওয়ার জন্মে অনেক উৎপীড়ন সহ্য করেছি মায়ের কাছে, এবার কি তোমার জুলুমও সইতে হবে?"

ডলি বললো, "আমার বাবা দিন তিন সের ত্বধ খেতেন। আমি খেতাম দিন এক সের। আমাদের চারটি মুলতানী গরু ছিলো। প্রত্যেক দিন ছ'সের করে ত্বধ দিতো। অতো ত্বধ কি করবো, তাই বন্ধু বান্ধবদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম। আজ আমরা গরীব বলে তোমায় এক কাপ ত্বধ সাধছি, খাবে না?"

"না, সব রকম জুলুম সইতে রাজী আছি, এ জুলুম নয়।"

"বেশ, খেয়ো না। আমি তোমার উপর জুলুম করবার কে? যখন তোমার শাদি হবে তখন দেখা যাবে। বৌ তোমার কান পাকড়ে ত্বধ পিলাবে।"

"পিলাবে নয়, খাওয়াবে।"

"যাই হোক, একই মানে। একটা ত্নটো ভুলতো মাঝে মাঝে হবেই। ত্বধ না খেয়েই তোমাদের ওই চেহারা। কি রকম নরম নরম মেয়ে মেয়ে দেখতে। মুখে দাড়ি নেই, গোঁফ নেই। সত্যি একটুও পুরুষত্ব নেই তোমাদের মধ্যে।"

"গোঁফ দাড়ি থাকলেই বুঝি পুরুষত্ব থাকে—?"

"পুরুষ মানুষের মতো দেখায়—।"

রজত হেসে বললে, "আমার এক বন্ধু ছিলো, তার এক হাত লম্বা দাড়ি। প্রত্যেকদিন দাড়িতে মাখতো ঈভনিং ইন প্যারিস হেয়ার অয়ল্। দাড়িতে বিনুনী বাঁধতো। রাত্তিরে শুতে যাওয়ার আগে দাড়িতে ক্লিপ এটে তবে শুতে যেতো। আমরা বলতাম দাড়িতে লাল রিবন দিয়ে একটি বোও বাঁধলেই পারো। একদিন সে টনি কিনে আনলো দাড়ি পার্ম্ করবে বলে। সে হোলো সত্যিকারের পুরুষ মানুষ, আর আমি যে প্রত্যেক দিন শেভ্ করি, চুল ছোটো করে ছাঁটি, মালকোচা মেরে ধুতি পরি, বুক ফুলিয়ে, শার্টের আস্তিন গুটিয়ে পৌনে ছ'ফুট দেহটি নিয়ে ঘুরে বেড়াই, কারো তোয়াক্কা করিনে, আমার হোলো পুরুষত্বের অভাব!"

"নয়তো কি! সত্যিকারের পুরুষ মানুষ মেয়েদের জুলুমকে ভয় করে না।"

"দুধ খেতে হলে করে—।"

"দাঁড়াও, আমি তোমার জন্যে দুধ নিয়ে আসি—।"

"না, প্লীজ, আমি খাবো না, মিছি মিছি নষ্ট হবে—।"

ডলি শুনলো না, উঠে দাঁড়ালো। অপেক্ষা করলো এক মুহূর্ত। তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

রজত চুপ করে রইলো।

দরজার কাছে গিয়ে ডলি ফিরে দাঁড়ালো। তারপর ফিরে এলো। বললো, "তুমি একটি ভীতু।"

"কেন?" একটু অবাক হোলো রজত।

"আমার হাত ধরে আটকে রাখবার সাহস তোমার নেই?"

রজত তাকালো ডলির দিকে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো।

"কোথায় যাচ্ছো," জিজ্ঞেস করলো ডলি।

"বাড়ি।"

"কেন ?"

"রাত হচ্ছে।"

রজত গেল দরজা অবধি।

"শোনো।"

রজত ফিরে দাঁড়ালো।

"এদিকে এসো।"

রজত এলো।

"সত্যি সত্যি যে কথা বলবার জন্যে এসেছিলে, সে কথা মুখ ফুটে বলতে অতো ভয় কিসের রজত ? না হয় আমি বলতাম তুমি চলে যাও, এসো না আমার বাড়ি। কি হয়েছে তা'তে ? দু'দিন আগে জান পহ্চান ছিলো না, দু'দিন পরেও না হয় থাকবে না।"

রজত চুপ করে রইলো।

খুব নরম গলায় ডলি বললো, "আমি আর বলবার কি বাকি রাখলাম রজত ?"

রজত বসে পড়লো।

ডলি এসে বসলো রজতের পাশে।

বললো, "বোকা, কাল যখন আমি ইন্দর সিংএর সঙ্গে বেরুচ্ছিলাম, তুমি ও'রকম টী-পটের মতো মুখ করে চলে গেলে কেন ?"

"ইন্দর সিং কে ?"

"আমার এক বন্ধুর হাজব্যাণ্ড। বন্ধুটি হাসপাতালে। তাকে দেখতে যাচ্ছিলাম।"

"ও।"

"আমায় আরেকজনের সঙ্গে বেরুতে দেখেই তোমার এত মন খারাপ ?"

"মন খারাপ ? না ! কে বললে—।"

"আমি দেখেই বুঝেছি। এ দু'দিন এলে না কেন?"

একটু পরে রজত বললো, "আজ উঠি। রাত হচ্ছে, কাল আসবো।"

"না! আরেকটু বোসো।"

রজত জিজ্ঞেস করলো এক সময়, "সেদিনই বুঝি প্রথম জানতে পারলে?"

"জানতে আমি অনেক আগেই পেরেছিলাম।"

"আমি কিন্তু পারিনি, রজত বললে।"

"ঠিকই পেরেছিলে, শুধু বলবার সাহস ছিলো না।"

"সাহস তুমি তো দিলে—।"

"আমি বলেই দিলাম। লাহোরে অনেক কিছু হারিয়ে এসেছি, বাপ, ভাই, পুরোনো দিন, সব কিছু। আমার নিজের বলতে কিছু নেই। এখন যদি কিছু আবার পেয়ে যাই, আমার কাছে যার অনেক দাম, তাকে তক্ষুনি হারিয়ে ফেললে আমার চলবে কেন? তাই সোজাসুজি বলে ফেললাম। এখানকার কোনো মেয়ে হলে দেখতে কিছু বলতো না। সে এখানে একা বসে কাঁদতো। তুমি একা বাড়ি বসে কাঁদতে। তারপর দু'দিন পর দু'জন দুজনকে ভুলে যেতে।"

শুনে রজত চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর বললো, "অনেক রাত হোলো, এবার বাড়ি যাই।"

"কাল আসবে তো!"

বাড়ি ফিরতেই শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো, "এত রাত হোলো কেন রে?"

"একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছি," খুব হাল্কা ভাবে বললো রজত।

শ্যামলী বুঝি ভাবলো তার সিরিয়াস প্রশ্নের উত্তরে রজতের রসিকতা হচ্ছে।

বিছানার উপর শুয়ে রজত ভাবলো, কি করে কি হয়ে গেল। কে

জানতো যে এমনি করে তার মনের অন্ধকারের ওপার থেকে ডলি দেশরাজের মতো একটি চাঁদ উঠে আসবে!

কিন্তু এবার তো কিছু করতে হবে। যাই হোক, একটা কিছু করতেই হবে। এদ্দিন নিরুপায় খড়ের মতো নিরাশার স্রোতের টানে গা' ভাসিয়ে দিয়েছিলো সে, কিন্তু এখন তো পায়ের নীচে ডাঙা না পেলে চলবে না!

উঠে এসে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। একটি আধখানা চুরুট ছিলো, ধরিয়ে নিলো সেখানি। ঝিরঝির করে দক্ষিনের হাওয়া এলো শহরের গুমোট অলিগলি পেরিয়ে, অফিস থেকে ফিরে আসা ক্লান্ত, সৌরভময়ী অবহেলিতার মতো। নিরালা পথের শিখা-টিম-টিম গ্যাসবাতির পাশ কাটিয়ে ভেসে চলে গেল নিঃসঙ্গ পথচারির ক্লান্ত ছায়া। ঢোল, করতাল আর দেহাতী গানের রেশ ভেসে এলো সুদূর বস্তি থেকে।

তারপর ক্রমশ শুব্ধ হয়ে এলো হ্যারিসন রোডের কোলাহল। মন্থর হয়ে-এলো শেয়ালদা'র ট্র্যাফিক। স্পষ্টতর হয়ে উঠলো দূরান্ত ট্রেনের বাঁশি। দূরে কলেজের হস্টেলে রাতজাগা পড়ুয়াদের জানলায় টুপটাপ নিভে গেল ইলেকট্রিক আলো। কুলপিওয়ালার ডাক শুনে তন্দ্রা ভেঙে পাশ ফিরলো নিদ্রালশ বধূ। এক ফালি চাঁদ এসে উঁকি মারলো সামনের বাড়ির ছাতের ওপারে।

তখন মাঝরাত। চারদিকে ঘুম নেমেছে অন্ধকার হয়ে। রাস্তার মোড়ে ডাস্টবিনের পাশে দু'চারটে অতৃপ্ত অভুক্ত কুকুরের চোখে ঘুম নেই শুধু।

আর ঘুম নেই ওপাশের ঘরে উমাকান্ত আর নীরজার চোখে।

উমাকান্ত বলছিলেন, "আমি আর ভাবি না, যা হবার হবে। আমার ক্ষমতায় যখন কুলোবে না, ওরা যে যার ব্যবস্থা নিজে নিজে করুক।"

"সে কথা বল্লে চলবে কেন," নীরজা গরম জলের মতো টগবগ করে উঠলেন, "ক্ষমতায় যদি না কুলোবে তো বাপ হয়েছো কেন? নিজের কর্তব্যটুকুও করবে না তুমি?"

"আমার কর্তব্য করার উপর তো আমার কোনো হাত নেই।"

"কেন নেই শুনি?"

"দুনিয়াটা বদলে গেছে নীরজা। আজকের দিনে আমাদের মতো অবস্থার লোক যারা, ওরা যা করতে চায়, সে যতো সামান্যই হোক না কেন, কিছুতেই করে উঠতে পারে না পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্যে। আমাদের সুখের চাবিকাঠি অন্য লোকের হাতে। বিয়ে করে নতুন সংসার পেতে তাকে ঠিকমতো চালানোর সামর্থ্য আজকাল খুব কম ছেলেরই আছে। যাদের সে সামর্থ্য আছে তারা আমার মতো লোকের মেয়ে বিয়ে করবে কেন? কী লাভ হবে তাদের? তাদের নজর পয়সাওয়ালা মেয়ের বাপেদের উপর। বিয়ে করতে পারে এমন ছেলে কম, তাই তাদের বাজার দরও বেশী।"

নীরজার কাছে এসব কথার কোনো মানে নেই। বললেন, "দেখ, ওসব বড়ো বড়ো কথা আমি বুঝিনে। মেয়ের বিয়ে দেওয়া তোমার আমার কর্তব্য, বিয়ে আমি দেবোই। হাজার অভাব অনটন অসুবিধের মধ্যেও আমার মা আমার বিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তুমি বাপ হয়ে পারবে না কেন? না হয় টাকাকড়ি আজকাল কিছু বেশী লাগবে। কিন্তু লাগলে দিতে হবে বই কি। জজ মেজিস্ট্রেট ছেলে চাইলে কি করে হবে? সাধারণ গেরস্ত ঘরের ছেলে দেখে টেখে দিয়ে দিতে হবে।"

শুকনো হাসি হাসলেন উমাকান্ত।

"জজ ম্যাজিষ্ট্রেটতো আমি চাইছি না। কিন্তু সাধারণ গেরস্ত ঘরের ছেলেই বা পাচ্ছি কোথায়? সাধারণ ঘরের ছেলেরা যে আজকাল বড়ো ঘরের মেয়ে খোঁজে। তাদের কিনতে পারি সে টাকাই বা আমার কোথায়?"

"আমি ছেলে একটি ঠিক করেছি।"

"তাই নাকি? কে সে?"

"দুর্গাদাস গুপ্তের ছেলে।"

"কে দুর্গাদাস গুপ্ত?"

"আমার মেজো পিসীর ননদের ছেলে।"

"তারপর?"

"ছেলেটি চাকরি করে। দেশে জমাজমি আছে। কলকাতায় বাড়ি আছে।"

"বাঃ, বেশ। দাবি দাওয়া?"

"বিশেষ কিছু নয়। হাজার তিনেক টাকার মতো গয়না দিতে হবে।"

হাসলেন উমাকান্ত। "অতো টাকা পাবো কোথায়?"

"কেন? প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ধার পাবে না?"

"কতোই বা পাবো? খুব বেশী হলে হাজার দেড়েক।"

"ব্যস্, তা'তেই হয়ে যাবে কোনোরকমে। আমার গয়নাগুলো থেকে কিছু ভেঙে নতুন করে গড়িয়ে ব্যবস্থা যা হোক একটা কিছু করা যাবে'খন।"

"তোমার গয়না বাঁধা দিয়ে, বেচে, কিছুই তো আর নেই বললেই হয়। তাও দিয়ে দেবে? শেষ সম্বল বলতে আর থাকবে কী?"

"আমার গয়না আমার মেয়ের বিয়েতে দেবো না তো কি আমার শ্রাদ্ধে দেবো?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, না হয় দিলে। কতোই বা হবে তা'তে। তা'ছাড়া বিয়ের অন্য খরচা নেই?"

নীরজা ভাবলেন একটুখানি, "আচ্ছা, আরেকটি কাজ করা যায় না?"

"কি?"

"মেয়ে বদল—!"

"মানে?"

"এমন একটি ছেলের খোঁজ করতে হবে যার আইবুড়ো বোন আছে। ওকে আমাদের বাড়ি আনবো রজতের বৌ করে। ওরাও টাকা চাইবে না, আমরাও টাকা চাইবো না।"

"তোমার ছেলেকে মেয়ে দেবে কেন? ও খাওয়াবে কি?"

"ও," চুপ করে গেলেন নীরজা। তারপর বললেন, "আচ্ছা, ও' কথা থাক। উপস্থিত সমস্যা রুপুর বিয়ে দেওয়া। তিন হাজারের কমে যদি না হয় তা'হলে ওই তিন হাজারেই রাজী হতে হবে।"

"কিন্তু অতো টাকা পাবো কোথায়?"

"ওই দেড় হাজার দিয়েই উপস্থিত একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

"কি রকম?"

"বিয়ের দিন দেড় হাজার দিও। ওদের হাতে পায়ে ধরে বোলো বিয়ের পর বাকিটা দেবো। কি করবে ওরা, ছেলেতো আর তুলে নেবে না?"

"তারপর দেড় হাজার আসবে কোত্থেকে?"

"আসবে না," দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নীরজা বললেন।

"মানে?"

"মানে, ওই দেড় হাজার আর দেওয়া হবে না। কথার খেলাপ হবে, এই আর কি। কিন্তু কি আর করা! উপায় তো নেই।"

উমাকান্ত বিছানার উপর উঠে বসলেন।

"নীরজা!"

কোনো উত্তর এলো না।

উমাকান্তের গলা তখন ধারালো হয়ে উঠেছে।— "তারপর ছেলের বাপের সঙ্গে আর কি আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে বলে মনে করো?"

"থাকবে না। আমাদের কি আর ক্ষতি। না হয় ওরা মেয়েকে বাপের বাড়ি আসতে দেবে না। নাই বা দিলে। মেয়ে তো সুখী হবে।"

খুব কোমল, খুব নিশ্চিত শোনালো নীরজার কথাগুলো।

উমাকান্ত বললেন, "মনে করো ওরা যদি মেয়েকে চিরকালের মতোই বাপের বাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দেয়, মেয়ে আর না নেয়, তখন কি হবে?"

"সে হয় না। ওরা মেয়ে না নিয়ে পারবে না।"

"কেন পারবে না?"

"আমি জানি পারবে না।"

"কি করে জানো?"

"আমার মন বলছে। রুপু আমার লক্ষ্মী মেয়ে। ওকে কেউ ফেলে দিতে পারবে না।"

মেয়েলী লজিকে উমাকান্তর ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। এক কল্পিত বেহাইএর মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে বসে গেলেন।

ফুঁপিয়ে কান্না জুড়ে দিলেন নীরজা।

হার মানতে হোলো উমাকান্তকে। বললেন, "আহা, কাঁদো কেন নীরু, আমি কি চাই না মেয়েদের বিয়ে-থা হোক? কিন্তু এসব করা উচিত নয়। আমি চাই মেয়ে আমার সুখী হোক।"

"আর আমি বুঝি চাইনে? আমি বুঝি অসুখী করতে চাই মেয়েকে! সব দোষ কি আমারই, সব অশান্তি কি আমারই জন্যে? তুমি সুখী হওনি, আমি সুখী হইনি, আজ আমার সংসারে সুখ নেই, শান্তি নেই, সব কিছুর জন্যে কি আমিই দায়ী? আমিই কি তোমার সব সুখের আশায় বাদ সেধেছি?"

আর বাক্যব্যয় নিরর্থক মনে করলেন উমাকান্ত।

পাশ ফিরে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন।

বার বার ডেকেও কোনো সাড়া না পেয়ে চুপ করে গেলেন নীরজা।

চোখে ঘুম এলো না।

পাশ ফিরে চেয়ে দেখলেন জানলা দিয়ে অনেক দূরের আকাশে অনেক উঁচুতে তিনটে লাল নীল সাদা আলো ভেসে যাচ্ছে। রাত্রিবেলার প্লেন।

মনে পড়লো বহুদিন আগেকার একটি দিন।

রাত্তিরে মায়ের পাশে চুপচাপ শুয়েছিলো কিশোরী মেয়ে নীরজা।

জানলার ফ্রেমে আঁটা আকাশে ছুটো তিনটে আকাশ প্রদীপ ভেসে যাচ্ছিলো।

সেদিন নীরজার পাকা দেখা হয়ে গেছে।

রাত্তিরে জেগে স্বপ্ন দেখছিলো সেদিনকার সেই কিশোরী মেয়ে—অনেক বয়সের চুল-পেকে-ওঠা স্বামী, নিজের পাকা চুলে সিঁদুর পরা নীরজা।

এঘরে ওঘরে ছেলে, বৌ, মেয়ে, জামাই। আর ঘরময় নাতি নাতনীর সোরগোল, হাসি, কান্না, মেয়েদের বকুনি।

ব্যস্, এর চেয়ে বেশী কিছুর আকাঙ্খা ছিলো না।

কিন্তু কিছুই পাননি আজো।

হয়তো পাওয়া যাবেও না।

প্লেন ভেসে চলে গেছে কোথায়, আর ভেসে চলে গেছে পুরোনো দিনগুলো।

গহন রাত নিস্তব্ধ হয়ে রইলো অজানা ভবিষ্যতের মতো।

রুপালী কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশে জেগে শুয়েছিলো শ্যামলী।

রুপালী সেদিন বলছিলো, "চলো দিদি, এখান থেকে পালিয়ে যাই।"

বাবা আর মা এখনো আছেন যে! তা' নইলে কবে পালিয়ে যেতো সে। এখানে নিজের দুঃখ কারো সঙ্গে ভাগ করবার উপায় নেই। যে যার নিজের গণ্ডির মধ্যে আছে।

আজ স্কুলের সেক্রেটারি নোটিস দিয়েছে। তার চাকরি শেষ। বাড়িতে কি করে জানায় সে কথা! যাক, সামনে দু'মাস গরমের বন্ধ। এখন না বললেও কেউ জানবে না। কিন্তু অন্য কিছু একটা খুঁজে নিতে হবে ইতিমধ্যে।

পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই একটা কিছু, সে জন্যে তার ভাবনা নেই। ছাত্রীর সংখ্যা যখন বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন, তাদের পড়ানোর লোকের প্রয়োজনও নিশ্চয়ই বেড়ে যাবে।

কিন্তু সেটা শ্যামলীর সমস্যা নয়—।

এই দৈনন্দিন জীবন আর ভালো লাগে না। একটা পরিবর্তন চাই।

সেই ঘুম থেকে উঠে রান্না, স্নান করে চারটি খেয়ে স্কুল, স্কুলের সেই বাঁধা-ধরা রুটিন। বকে বকে প্রাণান্ত। মেয়েরা পড়ে না, পড়া পারে না, পড়তে ওদের সবার ভালোও লাগে না। রোগা হাত পা, স্নিগ্ধ মুখে প্রখর চোখ, পারিবারিক জীবনের পটভূমিকা তাদের অবোধ মনেও বিষন্নতার মেঘলা ছায়া ফেলেছে।

তবু পড়াতে হয়, বকে যেতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। স্কুলের রাজনীতিতে একটা না একটা দলে ভিড়তে হয়, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে টিচার্স রুমে অন্য দু'একজন মাস্টারনীর সঙ্গে ঝগড়া করতে হয়। হেডমিসট্রেস্-এর বকুনি খেতে হয়, স্কুল সেক্রেটারির রক্তচক্ষুর সামনে মাথা নীচু করতে হয়।

ভালো লাগে না—। একটা পরিবর্তন চাই!

তার মনের নিভৃত কোণে একদা শানাইয়ের রেশ তো শোনা গিয়েছিলো। কিন্তু ছেলেটি যে এসেও থাকলো না।

তার কথা যে আজ মনে করবার চেষ্টা করলেও মনে পড়ে না। ঝাপসা হয়ে গেছে তার মুখ। দূর পথের বাঁকে একটি ছোট্ট বিন্দুর মতো মনে হয়। দূরবীন ছাড়া যেন দেখাই যাবে না।

আর দেখা গেলেও চেনা যাবে না।

যাক গে—। কিন্তু সামনে?

আবার যেন তার গহন রাতের সুখস্বপ্নে নতুন করে শোনা যায় কার পায়ের সাড়া। কুয়াশার অন্তরাল থেকে আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি

ছু'রুমের ফ্ল্যাট, প্রচুর আলো, হাওয়া, একটি ছোট্টো রান্নাঘর। —নিরালা, নিস্তব্ধ, শান্ত।

দুপুর গড়িয়ে আসে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে পাঁচটার দিকে। পাঁচটার সময় অফিস থেকে ফিরবে কে ?

শ্যামলী জানে না। দিন গুণে যাচ্ছে জানবার অপেক্ষায়।

॥ দুই ॥

এ অঞ্চলটা শহরের দক্ষিণে, নাম রেইনি পার্ক।

তখন বিকেল বেলা। ফুটফুটে পড়ন্ত রোদ্দুর। এ-বাড়ি ও-বাড়ির কম্পাউণ্ডে ছুটোছুটি করছে দুষ্টু ছেলেমেয়েরা। রাস্তায় দু'একটি প্র্যাম ঠেলে বেড়াচ্ছে নেপালী আয়ারা।

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থেকে একটি হিলম্যান গাড়ি বাঁয়ে ঢুকে ডাইনে একটি বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। ফটকে মর্মর-ফলকে লেখা —এম. চ্যাটার্জি।

গাড়ি গিয়ে থামলো একটি গাড়ি বারান্দার নিচে। গাড়ি থেকে নামলো নিখুঁত ছাঁটের ট্রপিক্যাল স্যুট পরা একজন। মুখে পাইপ। গম্ভীর। মাঝারি বয়েস।

একটি চাকর এসে গাড়ির ভেতর থেকে পোর্টফোলিও আর অন্যান্য ফাইলপত্তর বার করে নিলো।

চ্যাটার্জি সাহেব হলঘরটা পেরিয়ে সোজা খাওয়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

"দীপা!"

দীপালীর ছেলেটি স্কুল থেকে ফিরেছে কিছুক্ষন আগে। তাকে খাওয়াচ্ছিলো দীপালী।

ছেলেটি মুখ তুলে তাকালো।

"বাপি, আজ আমাদের রিপোর্ট কার্ড দিয়েছে—।"

"বেশ, রাত্তিরে দেখিও।"

"আমি অঙ্কে গোল্লা পেয়েছি।"

"বেশ করেছো। তোমার কি চাই বলো—।"

"ক্যামেরা—।"

"বেশ, কাল আমরা সবাই মিলে কোডাকে যাবো। দেখে শুনে একটি কিনে নেওয়া যাবে'খন।"

"কী ব্যাপার," দীপালী জিজ্ঞেস করলো, "খুব খুশী খুশী মনে হচ্ছে। সকালে যা মেজাজ দেখিয়ে গেলে— !"

"একটা খুব ভালো খবর আছে— ।"

"কি খবর ?"

"কি খাওয়াবে বলো ?"

"শুনিই না— ।"

"আজ থেকে কোম্পানির ডিরেক্টার হ'লাম।"

"সত্যি ?" খুব খুশী দীপালী।

খাওয়া শেষ হতে ছেলেটি উঠে চলে গেল।

"শেষ পর্যন্ত হলে ?" দীপালী বললো।

"হ্যাঁ, এদ্দিনকার কাঠখড় পোড়ানোর ফল ফললো শেষ পর্যন্ত। যা ভাবনা হয়েছিলো ! অন্য দলের ডিরেক্টারেরা নায়ারকে করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিলো। কিন্তু রতনলাল কারো কথাই শুনলো না।"

বছর দুয়েক আগে এক বিলিতী ম্যানেজিং এজেন্সি কিনে নিয়েছিলো কয়েকজন ভারতীয় ব্যবসায়ী। তার প্রধান অংশীদার শেঠ রতনলাল। দীপালীর স্বামী মোহিত চ্যাটার্জির সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয়। মোহিত রেডিওর চাকরি ছেড়ে তার ওখানে যোগ দিয়েছিলো লেবার এডভাইজার হয়ে। নামে লেবার এডভাইজার। কাজ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত। কাজ করতে পারুক না পারুক খোদ মালিককে নানারকম ভাবে সন্তুষ্ট করে রাখবার টেকনিক চাটুজ্যে সায়েবের খুব ভালোই জানা ছিলো। কিছুদিনের মধ্যেই সে রতনলালের ডান হাত হয়ে উঠলো। তাকে ছাড়া ইনকাম ট্যাক্সের গোলমাল এড়ানো যায় না, তাকে ছাড়া গভর্ণমেণ্টের

টেণ্ডারগুলো বাগানো যায় না। উপরতলার সরকারী বেসরকারী মহলে মোহিত চ্যাটার্জির জনপ্রিয়তা খুব।

আর এই জনপ্রিয়তায় দীপালীর ব্যক্তিত্বের অবদান যথেষ্ট, যাকে ছাড়া কলকাতার কোনো পার্টি জমে না, যার ছবি প্রায়ই দেখা যায় ইভ্স্ উইক্লি প্রমুখ সামাজিক সাময়িকীতে।

সেদিনও কোন একটি বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক দীপালীর ছবি ছাপিয়েছে তাদের কাভার-পেজ্-এ।

তা'হলে মোহিত চ্যাটার্জি এদ্দিনে ডিরেক্টার হোলো।

"যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো—।"

"সে পরে হবে। আগে এক কাপ খুব গরম চা খাওয়াও দিকি। বড্ড টায়ার্ড ফীল করছি।"

দীপালী নিজের হাতে চা ঢেলে দিলো এক কাপ।

তারপর মনের কথা পাড়লো:

"কিছুদিন ছুটি নাও। চলো বাইরে কোথাও বেরিয়ে আসি।"

মোহিত চোখ তুলে তাকালো দীপালীর দিকে। হাসলো একটুখানি। তারপর বললে:

"এখন নয়। এখন অনেক কাজ। মাস কয়েক যাক। তারপর লম্বা ছুটি নিয়ে একবার সুইটজারল্যাণ্ড ঘুরে আসা যাবে। অফিসের কাজেই হয়তো একবার বিলেত যেতে হবে আমায়—। ফেরার পথে যাওয়া যাবে'খন। তার আগে ক্ষমার বিয়ের ঠিকঠাক করে ফেলতে পারলে ভালো হয়।"

ক্ষমা মোহিতের ছোটো বোন। সবে মাত্র বি-এ দিলো লরেটো থেকে।

"অমিত আই-এ-এস পরীক্ষা পাস করতে পারেনি, শুনেছো?" দীপালী জিজ্ঞেস করলো।

"তা ই নাকি! ভেরি আনফরচুনেট। অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস অথচ এই পরীক্ষা তিন বারেও পাস করতে পারলো না! তবে আমার ধারণা কি জানো? ওর কিচ্ছু হবে না। বড্ড আইডিয়েলিস্টিক। মার্ক্সিস্ট লিটারেচার পড়ে টড়ে শুনেছি।"

"ও আজ আসছে।"

ভুরু কুঞ্চিত করলো মোহিত চ্যাটার্জি।

"কেন?"

"ক্ষমাকে নিয়ে কোথায় যেন যাবে। ওদের এক কমন ফ্রেণ্ডের জন্মদিন।"

"তাই নাকি। বেশ তো। আচ্ছা, তোমার কি ধারণা ক্ষমা ওকে খুব পছন্দ করে? আমার তো মনে হয় না। অমিত কি রকম যেন একটু গায়ে পড়ে ইনটিমেসি করতে চাইছে। তাই না? ক্ষমু ওকে বেশী এনকারেজ্ না করে যেন!"

দীপালী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো:

"আই-এ-এস্ এ ফোর্থ চান্স পায় না?"

মোহিত তাকালো দীপালীর দিকে। তারপর বললে, "আই-এ-এস ছেলে আমার খুব পছন্দ নয়, জানো? ক' টাকাই বা পায়!"

"তাই বা পাচ্ছো কোথায়," "দীপালী বললো। "গত বছর অনিমেষ তরফদার ফরিন সার্ভিস পেতেই স্যর মুকুন্দ গুহ তো তাকে একরকম টাকা দিয়ে কিনে নিলো। ওঁর মতো একজন পয়সাওয়ালা লোককে আউট-বিড্ করবার ক্ষমতা কি আমাদের আছে?"

"আঃ, দীপা, এখনো তোমার চইস্ অফ্ ওআর্ডস্ খুব হ্যাপি হয় না মাঝে মাঝে। আউট বিড্ কথাটা বড্ড গ্রস্। ও ভাবে ভাবো কেন। তবে হ্যাঁ, এই দুর্ভাগা বাংলা দেশে এখনো ভালো ছেলেদের মধ্যে কিছু উইক্‌নেস্ দেখা যায় ও ধরনের মেয়ের বাপদের জন্যে। যাক, সেটা কিছু

নয়। আমার তাতে কিছু আসে যায় না। আমি ওসব নেগোশিয়েটেড ম্যারেজ-এ বিশ্বাস করি না, তুমি তো জানো। আমি চাই ছেলেরা মেয়েরা ফ্রীলি মিশবে, যে যার নিজের মনের মতো লোক পছন্দ করে নেবে, বিয়ে করবে, সুখে থাকবে। তবে হঁ্যা, ভালো মন্দ বিচার করতে আমরা অভিভাবকেরা তাদের সাহায্য করবো। সে জন্যেই অমিতের সঙ্গে ক্ষমার বেরুনোতে আমি আপত্তি করবার কিছু দেখি না। অমিতকে আমরা এনকারেজ না করতে পারি, কিন্তু অমিতের সঙ্গে কোনো পার্টিতে গিয়ে যদি আর দু'দশজনের সঙ্গে চেনাশোনা হয়, হোয়াই শুড উই মাইণ্ড?"

বাইরে আরেকটি গাড়ির হর্ন শোনা গেল।

"অমিত বোধ হয় এসেছে," বললো দীপালী।

"তুমিই যাও। আমার আর উঠতে ইচ্ছে করছে না।"

দীপালী বেরিয়ে গেল।

"বৌদি!"

ঘরে এসে ঢুকলো একটি চটপটে মেয়ে। মোহিতের বোন ক্ষমা। খুব মিহি গলায় জিজ্ঞেস করলো, "বৌদি কোথায়?"

ইংরেজী এ্যাকসেণ্টে বাংলা।

"ও দিকেই গেছে," চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মোহিত বললো।

"দাদা, দে আর অল্ গোয়িং টু দি চেম্বার কনসার্ট এ্যাট দি লরেটো হাউস্ আফটার দি পার্টি। অমিট ইজ আস্কিং মি টু একম্প্যানি হিম্। উ্যড্ য়ু মাইণ্ড্ ইফ্ আই গো?"

বাংলা এ্যাকসেণ্টে ইংরেজি।

"নট্ এট্ অল্। ঘুরে এসো। বেশী রাত কোরো না।"

ক্ষমা চলে গেল।

বাইরে কিছুক্ষণ নারীকণ্ঠের কুহুধ্বনি। গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার আওয়াজ হোলো। গাড়ি বেরিয়ে গেল। দীপালী ফিরে এলো।

একটু উসখুস করলো দীপালী, তারপর বললো :

"আজ রজত এসেছিলো।"

"তাই নাকি," নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো মোহিত চ্যাটার্জি।

দীপালী একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে চুপ করে রইলো।

"ওদের কি খবর," মোহিত জিজ্ঞেস করলো।

"খবর আর কি," দীপালী উত্তর দিলো, "আছে এক রকম। তবে রজত এখন পর্যন্ত কোথাও কোনোরকম সুবিধে করতে পারেনি। আচ্ছা, তোমাদের ওখানে ওর একটি চাকরি করে দেওয়া যায় না?"

মোহিত কোনো উত্তর দিলো না।

"যদি পারো তো ওর একটি চাকরি করে দাও না!"

মোহিত চোখ তুলে তাকালো দীপালীর দিকে। এ রকম অনুরোধ-উদ্বেল কণ্ঠ দীপালীর কাছ থেকে নতুন। ও কারো জন্যে কারো কাছে কোনো কিছু চায় না।

"আমাদের ওখানে?" একটু চুপ করে থেকে মোহিত বললো, "আজ ওকে চৌরঙ্গিতে দেখলাম একটি ভারি সুন্দর পাঞ্জাবী মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি খুব স্মার্ট কিন্তু টিপিক্যাল রেফিউজি। মুখ দেখলেই বোঝা যায়। ওকে আগে কোথায় যেন দেখেছি। ঠিক মনে পড়ছে না!"

"ও মা—। তাই না কি!"

মোহিত একটু হাসলো। "এতে অতো শঙ্কিত হবার কী আছে দীপা? আমার মনে হয় রজত এবার ইমপ্রুভ করতে আরম্ভ করছে। লেট আস্ ওয়েট এ্যাণ্ড সি। রজত স্মার্ট ছেলে। ও নিজের রাস্তা ঠিক করে নেবে।"

"না, না, অতো স্মার্ট হয়ে দরকার নেই। ওকে চাকরি বাকরি যা হোক একটা করে দাও। তারপর দেখে শুনে ওর একটা বিয়ে দিয়ে দিই। আমার ওই একটি মাত্র ভাই, ও বখে গেলে বাবার খুব কষ্ট হবে।"

“ওরা তো তোমার কোনো খোঁজ নেয় না দীপা। ওদের জন্যে অতো মাথাব্যথা করে কি হবে?”

“আমরাই বা কী খোঁজ নিচ্ছি বলো? আর যাই হোক, আমার ভাই তো! ওর একটা ব্যবস্থা তুমি করে দাও—।”

“কি ব্যবস্থা করবো বলো।”

“ওর একটি চাকরি করে দাও তোমাদের অফিসে—?”

“কি চাকরি দেবো?”

“যা হোক একটা কিছু দিলেই হবে। শুনেছি ওঁরা খুব কষ্টে আছেন। বাবার পেনশান হয়ে যাবে শিগ্‌গিরই।”

“দেখ দীপা, ছোটো খাটো একটা চাকরি আমি দিতে পারি। কিন্তু তার একটু অসুবিধে আছে। কি জানো? সবাই বলবে চ্যাটার্জি সায়েবের শালা একজন অর্ডিনারি ক্লার্ক। আরো কি বলবে জানো? বলবে চ্যাটার্জি সায়েব অফিসে নিজের আত্মীয়স্বজন ঢোকাচ্ছে। ওকে যদি অফিসারের চাকরি দিই, এসব কথা উঠলেও তেমন গায়ে লাগবে না। কিন্তু সেখানে আবার অন্য অসুবিধে আছে। আজকাল রতনলাল, কিশনলাল এরা সবাই অফিসার গ্রেডের চাকরিগুলোতে নিজের জাতের লোক ঢোকাতে শুরু করেছে।”

“নিজেদের অফিসে না হয় নাই হোলো, অন্য কোনো অফিসে করে দাও না। তোমার তো কতো চেনা—।”

“দীপা, তোমারও তো কতো চেনা। এই তো হিকস্ কুইনের নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সঙ্গে তোমার এত আলাপ, তাকে বলো না—।”

দীপালী চুপ করে রইলো।

মোহিত হাসলো। “রজতকে ওদের কাছে ভাই বলে পরিচয় দিতে একটু অসোয়াস্তি বোধ করো, তাই না?”

দীপালী একটু লাল হয়ে গেল।

"না, না। তা নয়," দীপালী বললে, "তুমি তো জানো আমি অন্য লোকের কাছে কোনোদিন কোনো ফেভার চাইনি। তোমার জন্যেও চাইনি। আর তুমি থাকতে রজতের জন্যে এই ফেভার আমি অন্য কারো কাছে চাইতে যাবো কেন?"

"গ্যাট্‌স্ প্রিটি স্মার্ট," মোহিত হেসে বললো, "আচ্ছা, দেখি কি করা যায় আমার শ্যালকটির জন্যে। যদি করি তো ভালো কিছু একটা করবো। তবে একটু সময় লাগবে। ওকে এখন কিছু বোলো না।"

"আচ্ছা।"

"ও আজকাল এখানে আসতে শুরু করেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ, দু'চারদিন এসেছে ইতিমধ্যে।"

"কেন?"

"বা রে। আমার ভাই আমার কাছে আসবে না।"

"তোমার ভায়ের তো এদ্দিন মনে পড়েনি দিদির কথা। এখন চাকরির খুব দরকার হয়ে পড়েছে বলেই আসছে। হঠাৎ চাকরির জন্যে এত মাথা ব্যথা, কি ব্যাপার? ওই পাঞ্জাবী মেয়েটির সঙ্গে ইলোপ করবার মতলবে নেই তো?"

দীপালীর মুখ একটু কঠিন হয়ে গেল। কিছু বললো না।

মোহিত উঠে পড়লো।

"যাই, গা ধুয়ে আসি। আবার বেরুতে হবে—।"

"কোথায় যাবে?" জিজ্ঞেস করলো দীপালী।

"কেন?"

"ভাবছিলাম একবার বাবার ওখানে যাবো।"

"হঠাৎ!"

"রজত বল্লে আজ রুপালীকে দেখতে আসছে।"

"তাই নাকি! আমার শ্যালিকার বিয়ের ফুল তা'হলে ফুটলো!

আজকের দিনের বেস্ট নিউস্, বেটার হ্যাফ মাইন। কিন্তু, আজ তো যাওয়ার একটু অসুবিধে আছে দীপা!"

"কেন?"

"মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস দামোদরন কলকাতায় এসেছেন। আজ দামোদরন টেলিফোন করেছিলেন।"

দামোদরন একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী।

মোহিত বলে চললো, "প্রিন্সেস্‌এ একটি টেবিল রিজার্ভ করেছি। ওঁরা আসছেন। তোমারও না থাকলে তো চলে না— ।"

"আমায় তো আগে বলোনি— ।"

"বলবার সুযোগ পেলাম কোথায়। এসেই আমার খবর, তারপর তোমার খবর— "

"কিন্তু আমি যে বলেছি আমি যাবো— ।"

"এঁদের আমি বলেছি তুমিও আসছো। আর এঁদের এণ্টারটেন করায় আমার কি স্বার্থ তুমি তো জানো। এখন তুমি ভেবে দেখ কোথায় যাবে, তোমার বাবার ওখানে, না আমার সঙ্গে। আমি তো তোমার ইচ্ছের উপর কোনোদিন আমার জুলুম খাটাইনি।"

মোহিত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দীপালী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিকেল বেলায় পড়ন্ত রোদ নেমে গেছে পশ্চিমের ছাদগুলোর ওপারে। রাস্তায় এক্কা-দোক্কা খেলছে সামনের বাড়ির বাচ্চা মেয়েরা। জানলায় বসে তাই দেখছিলো রুপালী।

ভাবছিলো, বয়েসটা ভুলে গিয়ে আমিও নেমে যাই।

তারপর এলোমেলো নানা রঙের ভাবনা এলো বিকেল বেলার মেঘের মতো।

পেছনে পায়ের সাড়া। ফিরে তাকিয়ে দেখে, শ্যামলী

ছাত থেকে নামিয়ে আনা শাড়িগুলো পালিশ-উঠে-যাওয়া আলনায় গুছিয়ে রেখে শ্যামলী এসে দাঁড়ালো রুপালীর কাছে।

বললো, "চান করে আয় রুপু। তারপর আমি চুলটা বেঁধে দোবো'খন।"

"আমায় কি আজ দেখতে আসছে সত্যি সত্যি," রুপালী জিজ্ঞেস করলো তার বিষণ্ণ চোখ দুটি তুলে। ছায়া নামলো শ্যামলীর মনেও।

শ্যামলী আসন্ন সন্ধ্যার মতো ম্লান হাসি হাসলো।

রুপালী শ্যামলীর গলা জড়িয়ে বুকে মাথা গুঁজে রইলো কিছুক্ষণ।

শ্যামলী তার চুলে আঙুল বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করলো, "এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না বুঝি?"

উত্তর দেওয়ার আগে রুপালী দু'তিন মুহূর্ত চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "এত তাড়াতাড়ি পরের বাড়ি গিয়ে হাঁড়ি ঠেলতে ইচ্ছে করছে না।"

॥ তিন ॥

দেখতে যারা এলো সবাই অল্পবয়েসী। শুধু তিনজন।

একজনকে দেখতে কালো, খুব সাধারণ বোকা বোকা চেহারা, সিল্কের পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতিতে, রুমালের আতরে আর মুখের পাউডারে অনভ্যস্ত পারিপাট্য। বলে না দিলেও বোঝা যায় এই হবু জামাই।

আরেকজন তার জ্ঞাতি দাদা, বয়েসে কিছু বড়ো, খদ্দরের ধুতি, শার্ট, জওহর কোট আর পুরু শেলের চশমায় একটু সচেষ্ট মুরুব্বিয়ানা। আপাতত সেই ছেলের অভিভাবক।

অন্যজন এই সাময়িক অভিভাবকের বন্ধু। সাদা প্যাণ্ট আর সিল্কের হাওয়াইআন শার্টে সহজ বোহেমিয় ঔদাস্য, আশে পাশের সব কিছু দু'চোখ ভরে দেখে নেওয়ার নির্লিপ্ত পরিতৃপ্তিতে প্রসন্ন তার মুখ।

রুপালী একটি ঢাকাই শাড়ি পরে কাছেই বসে ছিলো চুপচাপ, মুখ নামিয়ে। যথাসম্ভব আপ্যায়ন করবার চেষ্টা করছিলেন উমাকান্ত। হবু জামাই একটি সন্দেশ ভেঙে ভেঙে মুখে দিচ্ছিলো, যার টুকরোগুলো যে কোনো পিঁপড়ের মুখের পক্ষেই নিতান্ত ছোটো। আরেকজন চুমুক দিচ্ছিলো চায়ের কাপে। কথা বলছিলো শুধু হবু জামাইয়ের অভিভাবক।

বলছিলো, "বুঝেছেন উমাকান্ত বাবু, আমাদের মতই প্রায় ফাইন্যাল, মেয়ে দেখে হরিদাসের যদি পছন্দ হয়, তা'হলে কাকাবাবু, অর্থাৎ হরিদাসের বাবা, আপত্তি করবেন না। হরিদাসের মুখ দেখে মনে হচ্ছে মেয়েও পছন্দ হয়েছে।"

হরিদাসের মুখ নীচু হোলো। বললে—"আঃ, কি যে বলো প্রসাদ দা।"

মুখ তুলে রুপালী হরিদাসকে একটু দেখলো।

সেটি লক্ষ্য করলো শুধু অন্নজন। একটু মুচকি হেসে চায়ের কাপে চুমুক দিলো সে।

প্রসাদ বলে চললো, "আমাদের তো মেয়ে পছন্দই হয়েছে। দাবি দাওয়ার ব্যাপার সে আপনারা বুঝবেন। তবে কাকাবাবু আমায় এটুকু বলে দিতে বলেছেন—ওটা আমার কথা নয় অবশ্যি, আমি পণপ্রথা প্রভৃতি ওসব কিছু সমর্থন করিনে, আমি শুধু কাকাবাবুর কথাই বলছি—উনি বলছেন গয়নাপত্তর আপনারা মেয়েকে যা খুশি দেবেন। তবে কিনা নগদ হাজার পাঁচেক টাকা দিতে পারলে ভালোই হয়, কারণ ওঁদের হাটখোলার বাড়িটি মরগেজ আছে হাজার দশেক টাকায়। এবার যদি সেটা ছাড়িয়ে নেওয়ার মতো কিছু টাকার ব্যবস্থা আপনি করে দেন তা'হলে বাদ বাকী টাকা কাকাবাবু নিজেই যোগাড় করে নেবেন। এতে আপনার আপত্তি করার কোনো কারণ হয়তো হবে না, যেহেতু হরিদাস কাকাবাবুর একমাত্র ছেলে, আর বাড়ি শেষ পর্যন্ত আপনার মেয়ে জামাইই পাবে।"

"তা'হলে আপনাদের বাড়িটিও মরগেজ," শুকনো হাসি হাসলেন উমাকান্ত। "কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা! একটু বেশী হয়ে গেল না?"

প্রসাদ বললে, "এটা কোনো দাবি দাওয়ার কথা নয়, কাকাবাবুও জোর দিচ্ছেন না, দিতে পারলে দেবেন, দেওয়ার যদি অসুবিধে হয় তা'হলে অন্য কিছু যা দেওয়ার যেভাবে দেওয়ার দেবেন। তবে কাকাবাবু বলছিলেন অন্তত হাজার তিনেক টাকার গয়না দেওয়াটা বাঞ্ছনীয়। তিনি চান না যে তাঁর বাড়ির বৌয়ের গয়নার অপ্রাচুর্য থাকে। তিনি চান এমন একটি মেয়ে যে সংসারের ভার নিতে পারবে। বাড়িতে গিন্নী গোছের কেউ নেই কিনা, কাকাবাবু আবার ঠাকুর চাকরের রান্না খেতে পারেন না। তার উপর হরিদাসের শিশুকন্যাটিরও দেখাশোনা করতে হবে, নিজের সন্তানের মতো বড়ো করে তুলতে হবে—।"

"হরিদাসের মেয়ে?" উমাকান্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

প্রসাদ উত্তর দিলো, "হরিদাসের আগে একবার বিয়ে হয়েছিলো, সে স্ত্রী মারা গেছে বছর দুয়েক হোলো। একটি মাত্র শিশু কন্যা রেখে গেছে। তবে তা'তে কিছু আসে যায় না। হরিদাসের বয়েস এখন মাত্র পঁচিশ।"

"বাবাজীর কি করা হয় ?"

"আমি চাকরি করি জন্ উইলিয়ামসন কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে, মেশিন শপের সুপারভাইজার।"

"না, না। হরিদাস কি করে তাই জিজ্ঞেস করছি।"

"ও। হরিদাস? চাকরি করে টেলিগ্রাফ অফিসে। পারমেনেণ্ট চাকরি।"

"আপনি কি করেন ?" উমাকান্ত জিজ্ঞেস করলো অন্যজনকে।

সে একটু হেসে চায়ের কাপটি নামিয়ে রেখে বললো, "আমি বিশেষ কিছুই করিনে।"

প্রসাদ বুঝলো ভাববার সুযোগ নিচ্ছেন উমাকান্ত। বললে, "কিছুই করে না বলা অনুচিত হবে। ও নানারকম ব্যবসা করবার চেষ্টা করে। এখনো একটিও ঠিকমতো করতে পারেনি।"

রুপালী চোখ তুলে একবার অন্যজনটিকে দেখলো।

"আমি ওর সঙ্গে স্কুলে পড়েছি।" প্রসাদ বলে চললো, "ওকে আমার বিশেষ বন্ধু বলে মনে করি। তাই ধরে নিয়ে এলাম। কাকাবাবু ওকে খুব পছন্দ করেন, তাই আমায় বার বার বলে দিলেন ওকে যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসি।"

উমাকান্ত পুলকিত হওয়ার ভান করলেন। "তাই নাকি ? বেশ বেশ, এসে ভালোই করেছেন। তা' মেয়েকে বাবাজীর কি রকম লাগলো ?"

সে হাসলো একটুখানি। বললো, "চট করে কি করে বলি বলুন।"

একটু ফ্যাকাশে হোলো উমাকান্তর মুখ। জিজ্ঞেস করলো, "কেন ?"

"আপনি তো মেয়ের গুণের পরিচয় কিছু দেননি। এই যে দ্বারিকের

সন্দেশ শিঙাড়া এনে খাওয়ালেন, একবারও তো বলেননি এগুলো দোকানের খাবার নয়, এগুলো আপনার মেয়ের হাতে তৈরী। মেয়ের মা মাসী দিদিদের হাতের কার্পেটের কাজ আর সেলাই দেখিয়ে মেয়ের হাতের কাজের প্রশংসা করেননি। পরীক্ষার আগে মেয়ের অসুখ করেছিলো, একেবারেই পড়তে পারেনি বলেই যে সে থার্ড ডিভিশান পেয়েছে, তা' নইলে যে সে ফার্স্ট ডিভিশান পেতো সে কথা বলেননি একটিবারও। পাশের বাড়ি থেকে ধার করা হারমোনিয়াম এনে মেয়ে-দেখানোর-দিনের পেটেন্ট গান দু'একখানা শুনিয়ে বলেননি আজ আমরা দেখতে আসবো শুনে সারা সকাল কেঁদে কেঁদে গলা বসে গেছে, তা নইলে আরো ভালো গায়। এককালে সুধীনলালের কাছে গান শিখতো, তাও বলেননি। নাচের পোজে তোলা ছবি দেখাননি, পাশের বাড়ির মেয়েদের সোনার মেডেল ধার করে এনে আপনার মেয়ের অমুক অমুক কম্পিটিশানে পাওয়া বলে গর্ব করেননি। আপনার মেয়ের গুণ কিছুই তো জানলাম না।"

প্রসাদ হাসলো। বললো, "ওর কথায় কিছু মনে করবেন না উমাকান্ত-বাবু, ওর কথাবার্তা ওরকমই।"

উমাকান্ত বললেন, "না, উনি ঠিকই বলেছেন। আমার মেয়ের ওসব কোনো গুণ নেই। নাচতে জানে না, গাইতে জানে না, আই-এ পাশ করেছে বটে, কিন্তু সে সাধারণ একটি সেকেণ্ড ডিভিশান।"

"কি আসে যায় তা'তে," বললে প্রসাদের বন্ধু, "বি-এ পাশ, আই-এ পাশ আর ম্যাট্রিক পাশ মেয়ের তফাত আমি বুঝিনে। একজন বি-এ'র নোট পড়ে পরীক্ষা দিয়েছে, আরেকজন আই-এ'র নোট পড়ে, অন্যজন ম্যাট্রিকের নোট পড়ে। বিদ্যেতো সবারই সমান।"

"আমার মেয়ে কালো—।"

"সেটি সমস্যা বটে। কালো মেয়েকে তো সুন্দর বলা চলে না, বড়ো জোর বিয়ের সময় উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে। সুন্দর বলা যায় ফরসা মেয়েদের,

ওদের নাক চোখ মুখ যাই হোক না কেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা-চামড়া যদি কালা আদমিকে তফাতে রাখে সেটা বর্ণবৈষম্য, বাংলা দেশে বিয়ের বাজারে যদি ফরসা মেয়ের চাহিদা বেশী হয় রঙ-ময়লা মেয়ের চাহিদার চেয়ে, সেটি ভারতীয় সৌন্দর্যতত্ত্ব, আর্য ঐতিহ্যের গরিমাময় অবদান।"

রজত এসে বললো, "বাবা, নীচের তলার ডাক্তার মিত্তির তোমায় ডাকছেন।"

"এখানেই নিয়ে আয়।"

ডাক্তার মিত্তিরকে উপরে নিয়ে এলো রজত, সঙ্গে আরো একজন পাড়ার মাতব্বর।

"এই যে ডাক্তারবাবু, আসুন, কিছুক্ষণ আগে গিয়ে আপনাকে পাইনি, তা নইলে আমি নিজেই ডেকে নিয়ে আসতাম আপনাকে। এঁরা এসেছেন রুপুকে দেখতে। এখন আপনাদের আশীর্বাদে যদি বিয়েটা নির্বিঘ্নে হয়ে যায়—। ওরে রজত, এদের চা দিতে বল।"

"না, না, আমরা আর বসবো না, অন্য একটা জরুরী কাজে এসেছিলাম," বললে ডাক্তার মিত্তির, "আমরা একটি পণপ্রথা বিরোধী আন্দোলন সংগঠন করবার চেষ্টায় আছি। উপস্থিত একটি এড-হক কমিটি করা হয়েছে। আমি তার কনভেনার। কাল মুরারি দত্ত স্কোয়ারে একটি মিটিং করে ডেপুটেশান যাবে ডাক্তার বিধান রায়ের কাছে, যাতে এসেম্ব্লির এই অধিবেশনেই পণপ্রথা বেআইনী করে একটি আইন পাশ করানো যায়, এর জন্যে আমরা গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করছি, আর সেই সঙ্গে এও অনুরোধ করতে এসেছি যে মেয়ের বিয়েতে আপনারা এক আধলা পণ দেবেন না।"

"এ অঞ্চলে অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক আছেন বুঝি," চোখ বুজে জিজ্ঞেস করলো প্রসাদের বন্ধু।

"অনেক," উত্তর দিলো ডাক্তার মিত্তিরের সঙ্গী, "যে বাড়িতে গেছি, প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই অন্তত একটি করে আইবুড়ো মেয়ে—।"

"তিন মাস পর কর্পোরেশনের ইলেকশান আসছে। ডাক্তার মশাই দাঁড়াচ্ছেন বুঝি ?"

ডাক্তার একটু অপ্রস্তুত হলেন। "না, না, সে কথা কেন। আমি চিরকালই পরের সেবা করে বেড়াই— ।"

"আমাদের এসব কথা বলা নিরর্থক। একে বলুন," বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো হরিদাসকে। "এর বাবা পাঁচ হাজার টাকা পণ চাইছেন।"

রুপালী মুখ তুলে প্রসাদের বন্ধুকে এক নজর দেখলো।

নীরজা দরজার আড়াল থেকে এদের কথাবার্তা শুনছিলেন। শ্যামলী ভেতর থেকে ডাকলো, "বাবা, মা একবার ডাকছেন, শুনে যাও।"

ডাক্তার মিত্তির এবং তাঁর সঙ্গীও উঠে পড়লেন।

আর উঠে বেরিয়ে গেলেন উমাকান্ত।

প্রসাদ বললে, "ভাই, আজকালকার দিনে মেয়ে দেখতে আসার মতো ঝকমারি আর নেই। ছেলের বাপেরা বোঝে না, পঞ্চাশটা তাল বায়নাক্কা করে, মেয়ের বাপদের কাছে শাইলকের অভিনয় করতে করতে আমাদের মতো লোকের প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। কী যে পাপ করেছিলাম এই হতভাগার জ্ঞাতির খুড়তুতো ভাই হয়ে জন্মে—। কাকাবাবু আমায় খুব স্নেহ করেন, ওঁর কথা ঠেলতে পারিনে, তা' না হ'লে……।"

খুব আস্তে আস্তে বলছিলো সে, যাতে হরিদাস বা রুপালীর কানে না যায়।

উমাকান্ত ফিরে এসে বললেন, "বাড়ির ভেতর ওঁরা বলছেন আমাদের আপত্তি নেই। তবে দাবি দাওয়া একটু কমাতে হবে। আপনার কাকাবাবুকে একবার পাঠিয়ে দেবেন, অথবা আমায় জানাবেন কবে যাবো। কথাটা

ওঁর সঙ্গেই পাকাপাকি করে ফেলা যাবে। ওঁকে বলবেন আমাদের ছেলে পছন্দ হয়েছে।"

এবার রুপালী কথা বললো।

"কিন্তু, বাবা, আমার তো পছন্দ হয়নি—।"

হঠাৎ যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল পৃথিবী। আকাশটা নেমে এলো বাড়ির ছাতে। আকাশের চাঁদ আর তারাগুলো জানলায় এসে ভিড় করে দাঁড়ালো অবাধ চাউনি মেলে দিয়ে।

রুপালী তার নিজের মত জানিয়ে দিলো সোজাসুজি। রুপালীর মুখে কোনোদিন কথা ফোটেনি, যে সারা জীবন অন্যের প্ল্যান করা খাতে বয়ে এসেছে, যার কোনো ব্যাপারে যে কোনো মতামত থাকতে পারে সেকথা কেউ ভাবতেই পারে না।

রুপালী বলে গেল, "বিয়ে করবো আমি, ভবিষ্যৎটা আমার, তাই নিয়ে তোমরা যেমনি খুশি দায় সারবে আমার পছন্দ অপছন্দ মতামতের অপেক্ষা না রেখে, সেটা আজকের দিনে তুমি কি করে ভাবতে পারো বাবা? আমি কোনোদিন তোমাদের কারো কোনো কথার উপর কথা বলিনি, কারণ আমি চাইনি যে সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আবার আমার জন্যেও তোমাদের মনে কোনো অশান্তি আসে। আজ না বলে পারছিনা এজন্যে যে আমার বিয়ের ব্যাপারে আমার ছাড়া আর কারো মতামতের কোনো দাম নেই।"

"যা করছি তোর ভালোর জন্যেই তো করছি মা," বিহ্বল হতাশায় বললেন উমাকান্ত।

"তাই তুমি ভাবছো। কিন্তু সত্যিই কি তাই? যে বাড়িতে আমায় দিতে চাইছো, সেখানে গিয়ে যা করতে হবে,—পরের মেয়ের আয়া, বাসন মাজবার ঝি, রান্নাঘরের রাঁধুনি আর রাত্রি বেলার সঙ্গিনী—সে সব আমি যদি টাকা নিয়ে অন্য লোকের বাড়ি আলাদা আলাদা ভাবে করি,

তা'হলে যতো টাকা আমি আয় করতে পারি ততো টাকা ওই ছেলেটি মাইনে পায় কিনা তুমি তাকে একবার জিজ্ঞেস করেছো ?"

"রুপু !" শ্যামলী ডাকলো ভেতর থেকে। কিন্তু চিরকালের স্বল্পবাক মেয়েটি আজ ক্ষেপে উঠলো। বলে গেল সে, "আর প্রসাদ বাবু, আপনারা যে পাঁচ হাজার টাকা পণ চাইছেন বাবার কাছে, সে টাকা বাবা যদি আমায় ব্যবসা করতে দেন, তা'হলে আপনার ওই ভাইটিকে যে মাইনে দিয়ে রাখতে পারি সে কথা আপনাদের মাথায় কি ঢুকবে না কোনো দিন ?"

হরিদাস ঘামতে শুরু করলো। বলল, "প্রসাদ দা', বাড়ি চলো।"

ভেতর থেকে কালবৈশাখীর মতো বেরিয়ে এলেন নীরজা। বললেন, "কী অসভ্যের মতো কথা বলছিস রুপী ? তোর জন্যে কোন্ রাজপুত্তুর জুটবে শুনি ? লেখাপড়া জানা মেয়ে তো আমার আরো একটি রয়েছে, কি জুটলো তা'তো দেখছি।"

"বিয়ে যে করবো তাই বা তোমার কে বল্লে," ফোঁস করে উঠলো রুপালী, ল্যাজ মুচড়ে দেওয়া সাপের মতো। "তুমি পড়তে মানা করছো, পড়া বন্ধ করেছি। এর পর যা করবার আমি করবো।"

"কি করবি শুনি ?"

"চাকরি করবো—।"

"কে চাকরি দেবে তোকে ? আমার এম-এ পাশ ছেলে বসে আছে দেড় বছর, চাকরি পায় না, তুই একটি মেয়ে, তোকে কে চাকরি দেবে ?"

"যারা ছেলেদের চাকরি দেয় না, তারাই দেবে।"

"দেবে ? কি দেখে দেবে শুনি ?"

"মুখ দেখে দেবে।"

"কী যে শুরু করছো মা বাইরের লোকজনের সামনে," বলতে বলতে শ্যামলী বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে, রুপালীর হাত ধরে টানলো, বললো, "ওঠ এখান থেকে। ভেতরে চল।"

হরিদাস বললো, "প্রসাদ দা', বাড়ি চলো।"

কথা বললো না শুধু তিনজন।

চুপ করে রইলো প্রসাদ।

মাথায় হাত দিয়ে পাথর হয়ে বসে রইলেন উমাকান্ত, মধ্যবিত্ত কেরানী জীবনের হাস্যকর ট্র্যাজেডির একজিবিশানে খেলনা পুতুলের মতো।

আর রুপালী একটা বিপুল ক্লান্তিতে নিস্তেজ হয়ে পড়লো, সব কিছু সয়ে যাওয়া জীবনে হঠাৎ একটি প্রতিবাদের পাগলা ঝড় থেমে যাওয়ার অবসন্নতায়।

হাসিতে বেঁকে যাওয়া ঠোঁটের প্রান্ত থেকে সিগারেটখানি বার করে ছাইদানে আগুনটি পিষে নেভালো প্রসাদের বন্ধু।

তারপর বললে, "আপনি চাকরি করবেন?"

মুখ দিয়ে উত্তর বেরুলো না রুপালীর।

সে বলে চললো, "কোথাও চেষ্টা করেছেন?"

এবার রুপালী ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিলো, "না।"

"চেষ্টা করবার কেউ আছে?"

"না," বললো রুপালী।

প্রসাদের বন্ধু পকেট থেকে মানিব্যাগটি বার করলো, আর ভেতর থেকে তুললো একটি ভিজিটিং কার্ড। কলম বার করে কার্ডের অন্য পিঠে একটি ঠিকানা লিখে কার্ডখানি দিলো রুপালীকে।

বললো, "এরা লোক নিচ্ছে, আমার বন্ধু এ অফিসে পাবলিক রিলেশান্স ম্যানেজার। কাল পরশু একদিন গিয়ে দেখা করবেন ওর সঙ্গে। বলবেন, আমি পাঠিয়েছি। কার্ডখানি দিলেই বুঝবে। আমি ইতিমধ্যে বলে রাখবো।"

কার্ডখানি হাতে নিয়ে রুপালী দেখলো ভারি সুন্দর ইটালিক টাইপে লেখা আছে ওর নামটি—প্রবাল মুখার্জি।

রাত নিথর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থমথমে বিষণ্ণতার অন্ধকারে বাড়ির আবহাওয়া আরো জমাট হয়ে এলো। মন সবারই খারাপ। একসঙ্গে খেতে গেল না কেউ। শ্যামলীই সাধাসাধি করে এক একজন করে সবাইকে খাইয়ে দিলো। যে যার মতো খাওয়া দাওয়া সেরে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। রুপালী ছাতে গেল নিজের মনে একা পায়চারি করতে।

দূরে কোথায় শানাই বাজছিলো কাদের বাড়ির বিয়ের আসরে। অন্ধকার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ শুনছিলেন নীরজা। শ্যামলী এসে পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "খাবে না মা, রাত অনেক হোলো।"

কোনো উত্তর দিলেন না নীরজা।

শ্যামলী বললো, "চলো, মা, তোমার ভাত যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!"

তবু কোনো উত্তর দিলেন না নীরজা।

মায়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো শ্যামলী। গলাটা আরো কোমল করে বললে, "রুপুর ওপর রাগ করেছো মা? ও নেহাত ছেলেমানুষ।"

নীরজা একটু শুকনো হেসে বললেন, "না।"

"খেতে চলো মা, অনেক রাত হোলো যে—।"

নীরজা বললেন, "তুই খেয়ে নে' গে' যা, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়। আমি এক সময় খেয়ে নোবো'খন।"

শ্যামলী আস্তে আস্তে সরে গেল সেখান থেকে।

ছাতে উঠে এলো।

এসে দেখলো পাঁচিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে রুপালী।

"কি ভাবছিস রে?" শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো।

রুপালী মুখ ফিরিয়ে দেখলো শ্যামলীকে।

তারপর বললো, "চাঁদের ওপাশে দপদপ করে একটি মস্তো বড়ো তারা জ্বলছে দেখছো? তাই দেখছিলাম। ভাবছিলাম মাঝ-সমুদ্রে জাহাজ-ডুবি হওয়া নাবিকেরা এদের দেখে পথের নির্দেশ পায়, ডাঙায় আমাদের কোনো কাজে লাগে না, শুধু কবিত্ব করা ছাড়া।"

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলো, "হ্যাঁ ভাই ছোড়দি, আমার উপর রাগ করেছো?"

শ্যামলী কোনো উত্তর দিলো না, ডান হাত দিয়ে রুপালীর কোমর জড়িয়ে ধরলো।

"আচ্ছা, ছোড়দি, বাবা পণের পাঁচ হাজার কোথায় পেতেন শুনি?"

"বাবা রিটায়ার করছেন আগামী মাসে। ওরা এক্স্‌টেন্‌শান্‌ দিচ্ছে না। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাগুলো এবার হাতে আসবে।"

রুপালী দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললো, "ওটাতো বাবার শেষ সম্বল। যাক্‌, বিয়েটা ভেঙে দিয়েছি, ভালোই হোলো।"

শ্যামলী কোনো উত্তর দিলো না।

দুজনে হাত ধরাধরি করে অনেকক্ষণ পাশাপাশি পায়চারি করলো ছাতের উপর। দূর স্টেশনের ঘড়িতে বারোটা যখন বাজলো শ্যামলী বললে, "আর রাত জেগে কি হবে? চল শুতে যাই।"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রুপালী বললো, "জানো ছোড়দি, একটি কথা তোমায় বলছি, আর কারো কাছে কোনোদিন মুখ ফুটে বলবো না, আঘাত যতোই পাই না কেন, জীবনের কাছে হার মানবো না। এই আবহাওয়া আর ভালো লাগছে না। অনেক সয়েছি আর নয়। যেমন করেই হোক এবার পরিবর্তন চাই। যথেষ্ট কষ্ট পেয়েছি জীবনে, বাবাও কষ্ট পেয়েছেন আমাদের জন্যে। এবার যেমন করেই হোক সুখী হওয়ার পথ খুঁজে বা'র করতেই হবে। কেন মিছিমিছি আমার জন্যে কষ্ট পাবে সবাই।"

শ্যামলী অনেকক্ষণ ভাবলো রূপালীকে বলবে কিনা। তারপর বলে ফেললো।

"জানিস, আমায় চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ, কাউকে বলিস না। শুনলে মায়ের আর রাত্তিরে ঘুম হবে না। সামনে তো দুমাস গরমের ছুটি, স্কুল বন্ধ, মা টের পাবেন না। ইতিমধ্যে আরেকটা চাকরি যে করে হোক যোগাড় করে নিতে হবে কোথাও।"

রূপালী আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

ওরা ছাত থেকে নেমে এলো।

নিচে নেমে এসে শ্যামলী দেখলো খাওয়ার পাট চুকিয়ে নীরজা রান্না-ঘরের দরজা বন্ধ করে শুতে যাচ্ছেন। মেয়েদের দিকে তিনি তাকালেনই না। চুপচাপ চলে গেলেন নিজের ঘরে।

একই ঘরে দুজনে মিলে থাকতো শ্যামলী আর রূপালী। রূপালীকে শুইয়ে তার গায়ের উপর একটি কাপড় টেনে দিয়ে শ্যামলী ওর পাশে বসে চুলে আঙুল চালালো কিছুক্ষণ, তারপর আনমনে জিজ্ঞেস করলো, "হ্যাঁ রে রূপু, তুই আর বিয়ে করবি না?"

"কেন করবো না," জিজ্ঞেস করলো রূপালী।

"কবে করবি?"

"যেদিন বিয়ে করবার মতো একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে সেদিন।"

শ্যামলী হাসলো। "কি রকম ছেলে বিয়ে করতে চাস?"

"যাকে বিয়ে করে আমি সুখী হতে পারবো, সে রকম ছেলে।"

শ্যামলী আর কিছু না বলে রূপালীর গায়ে হাত বুলোতে লাগলো।

একটু পরে রূপালী জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা দিদি, তুমি বিয়ে করবে না?"

"কে বললে করবো না?"

"কি রকম ছেলে তোমার পছন্দ, ছোড়দি?"

শ্যামলী একটু হেসে বললে, "যে ছেলের মনে হবে আমায় বিয়ে করলে সে সুখী হবে সেরকম ছেলে।"

রুপালী ওপাশ ফিরে শুয়েছিলো। একথা শুনে এপাশ ফিরলো। অন্ধকার ভেদ করে তার চোখ দুটো শ্যামলীর মুখখানি দেখবার চেষ্টা করলো। পারলো না। শুধু নিজের মন দিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করলো শ্যামলীকে। অন্ধকারে দু'বোনের মন দুটো যেন বড়ো কাছাকাছি—তবু একটা দুর্বোধ্য অমিলের ব্যবধান, তাই যেন মনে হোলো রুপালীর। আবার ওপাশ ফিরলো।

শ্যামলী উঠে গেল আস্তে আস্তে।

নিজের বিছানায় শুয়ে হঠাৎ নিজের মনকে খুব অবসন্ন মনে হোলো শ্যামলীর। চোখ দুটো আস্তে আস্তে ভারী হয়ে বুজে এলো। তারপর সেই ঘুম নেমে আসা জড়িমায় মনে হোলো তার নিজের এখনো খাওয়া হয়নি। বাড়ির সবাইকে সে ডেকে নিয়ে সাধাসাধি করে খাইয়েছে। সে নিজে খেয়েছে কিনা সে খোঁজ কেউ করেনি, এমন কি মা-ও নয়। সবারই রাগ, সবারই অভিমান, সবারই মধ্যে দারিদ্র্যের প্রচণ্ড ঔদ্ধত্য। নিজের সমস্যাই সবার কাছে বড়ো, নিজের নিজের দৃষ্টিকোণই সবার কাছে একমাত্র সত্য, আর কেউ যেন কিছু নয়।

জীবনের আকাশে নিজেকে একটি নিঃসঙ্গ তারা বলে মনে হোলো শ্যামলীর।

পরদিন সকাল হোলো। পথ দিয়ে পাটালি গুড় হেঁকে গেল প্রত্যেক-দিনকার মতো। কাদের বাড়ি থেকে যেন ডাকলো শিশি-বোতল-কাগজ বিক্রিকে। পুরোনো আনন্দবাজার কি যুগান্তর বেচে তাদের আজ

বাজার খরচ চলে যাবে হয়তো। রুপালী তাক থেকে পাড়লো চায়ের ডিশ আর কাপ। শ্যামলী চায়ের পাতা ভেজালো মুখের খানিকটা ভাঙা কেটলিতে।

রজত এসে প্রত্যেকদিনকার মতো রান্নাঘরের দরজা থেকে চেঁচিয়ে গেল, "চা হয়নি এখনো? আমার চা'টা একটু কড়া করে কোরো।"

রুপালী তার নিজের কাজ করে যাচ্ছিলো প্রত্যেকদিনকার মতো। জীবনের কাছে আজ পর্যন্ত সে প্রত্যেকটা একই ছাঁচে গড়া দিনই পেয়েছে। আজকের দিনও নিশ্চয়ই কেটে যাবে অন্যান্য দিনগুলোর মতো। তাকালো শ্যামলীর দিকে। একটু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো শ্যামলীর মুখে একটি নতুন খুশীর আলো জ্বলছে।

রজত প্রত্যেকদিনকার মতো মায়ের কাছে যাচ্ছিলো চার ছ' আনা পয়সা চাইতে। তাকে মাঝ পথে থামিয়ে শ্যামলী বললে, "আবার ওদিকে কেন? কাল অনেক টাকা মিছিমিছি খরচা হয়ে গেছে ওদের মিষ্টি খাওয়াতে।"

রজতের মুখ কালো হয়ে যেতেই সে নিজের খুঁট থেকে দুটো টাকা বার করে দিলো।

রজত বললে, "ছোড়দি—!"

"কি?"

"দু টাকা নয়, আমায় বরং দশটা টাকা ধার দাও—।"

"ও—মা, দশ টাকা কি হবে?"

"দিল্লিতে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে একটি চাকরির দরখাস্ত করবো ভাবছি। ওরা যা' যা' কোয়ালিফিকেশান চেয়েছে, সবই আমার আছে। সাড়ে সাত টাকা লাগবে। আর খুচরো টাকা দেড়েক দুয়েক টাইপের খরচা, পোস্টেজ ইত্যাদিতে যাবে। এ টাকা তোমার পরে ফিরিয়ে দেবো।"

শ্যামলী একটু হাসলো। রজত কোনোদিন তার কাছে টাকা এমনি নেয় না, ধার নেয়, যে ধার শোধ হয় না কখনো।

নিজের ঘর থেকে এনে দিলো দশটা টাকা।

রজত টাকা নিয়ে চলে গেল খুব খুশী হয়ে।

উমাকান্তর ঘরে গিয়ে আর দশটা টাকা তাঁকে দিলো শ্যামলী। বললে, "ঘরে চাল নেই একটুও। সের দশেক চাল আনিয়ে নাও। আর যে পাঁচ টাকা বাঁচবে ওটা তোমার কাছে রেখে দাও।"

রুপালী একটু অবাক হোলো। স্কুলের চাকরি চলে গেছে শ্যামলীর, হাতে যা আছে সব বিলিয়ে দিচ্ছে কেন?

"ও ভাবে টাকাগুলো খরচা করছো কেন ছোড়দি?"

"খুব বেশী খরচা করছি না তো। ও, তুই জানিস না বুঝি, স্কুল থেকে আমায় এক মাসের নোটিস না নিয়েই ছাড়িয়ে দিচ্ছে বলে এক মাসের মাইনে বেশী দিয়েছে।"

"তাই বলে খরচা করে ফেলবে টাকাগুলো?"

শ্যামলী একথার উত্তর না দিয়ে চায়ের কাপ ডিশ ধুতে লাগলো। খুব হাসি হাসি তার মুখ। তারপর একবার আনমনে জিজ্ঞেস করলো, "হ্যাঁ রে, ওই ভদ্রলোকটি কে রে?"

"কোন্ ভদ্রলোক?"

"যিনি তোর চাকরি করে দেবেন বলেছেন?"

"কি জানি কে, ওদের বন্ধু। প্রবাল মুখার্জি।"

"বেশ লোকটি," শ্যামলী বললো, "বেশ মিষ্টি নাম।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "ওঁর সঙ্গে যদি দেখা হয় ওঁকে একদিন খেতে ডাকিস, কেমন?"

"কেন?"

"বা রে, উনি তোর চাকরি করে দেবেন, খাওয়াবি না একদিন?"

"ও!" রুপালী হাসলো। "চাকরি আগে হোক, তারপর দেখা যাবে।"

অকারণে শ্যামলীর কান দুটো লাল হোলো। রুপালী হেসে ফেললো। রুপালীর গালে একটি ঠোনা মেরে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শ্যামলী।

কিছুক্ষণ পর রুপালী দেখলো জামাকাপড় পাল্টে শ্যামলী বেরুচ্ছে।

"যাচ্ছো কোথায় ?"

"বাজারে।"

"বাজারে? তুমি?" রুপালী অবাক। শ্যামলীর বাজারে যাওয়া মানে বাড়িতে কোনো বিশেষ খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার। আজ হঠাৎ এই আকস্মিক বিলাসিতা!

"তুই আই-এ পাশ করলি, আমরা একদিন খাওয়া দাওয়া করবো না?"

হঠাৎ রুপালীর চোখ জলে ভরে উঠলো। আই-এ'র রেজাল্ট বেরিয়েছে আজ সাত দিন হোলো, তার পাসের খবর উপলক্ষ করে কোনোরকম আনন্দ প্রকাশের আয়োজন হয়নি। এমন সময় খবর বেরুলো যখন মাসের পোনে-রোটা দিন কেটে গেছে, টান পড়তে শুরু করেছে দৈনন্দিন খরচার বাজেটে।

খবরটা এনেছিলো রজত।

বাড়িতে ঢুকেই বললে, "ওরে রুপু, আই-এ'র ফল বেরিয়েছে।"

শ্যামলী রুপালী ছুটে এলো। রজতের মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না, খুশী না হতাশা। রুপালীর বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো।

শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো, "রুপুর রোল নাম্বারটি মনে ছিলো তো?"

"হ্যাঁ— ।"

"দেখেছিস— ?"

"হ্যাঁ— ।"

"কি দেখেছিস বলেই ফ্যাল না," শ্যামলী অধৈর্য হয়ে বললো।

"খবর ভালো নয়— ।"

"ও মা, সে কি? পাস করেনি?"

রুপালীর চোখের সামনে ঘরটা দুলতে শুরু করলো।

"পাস করবে না কেন? কলকাতা ইউনিভার্সিটির আই-এ পাস করা এমন কি শক্ত কাজ" অনেক আগে পাস করে যাওয়া ছেলেদের মতো মুরুব্বিয়ানায় রজত বললে, "তবে থার্ড ডিভিশান।"

সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললো রুপালী।

"পাস করেছে এই ঢের—" বললে শ্যামলী।

মাকে গিয়ে বললো, "জানো মা, রুপু পাস করেছে।"

"করেছে নাকি? বাঁচিয়েছে। ফেল করলে কতোগুলো টাকা লোকসান যেতো—।"

উমাকান্ত শুনে যে খুশী হলেন সেটা বোঝা গেল তাঁর ঝলমল করে ওঠা মুখ দেখে। তবে মুখে বেশী কিছু বললেন না। শুধু বললেন, "কয়েক মাস খুব খেটেছিস। এবার কিছুদিন বিশ্রাম নে, যতো পারিস ঘুমো—।"

রাত্তিরে শ্যামলী শুধু জিজ্ঞেস করলো, "হ্যাঁ রে রুপু, তোর কিছু চাই?"

"না।"

তারপর তো ক'দিন ধরে মেয়ে দেখানোর তোড়জোড়।

আজ এদ্দিন পর শ্যামলী বললে, "তুই পাস করলি, আমরা একদিন খাওয়া দাওয়া করবো না?"

ছোড়দি না থাকলে কবে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতাম, রুপালী ভাবলো। চলে যেতাম যেদিকে দুচোখ যায়।

পথে নেমে শ্যামলী ভাবলো শেয়ালদা'র বাজারে গিয়ে কি হবে, নিউ-মার্কেট থেকে কিছু মাংস কিনে নিয়ে আসি। ছুটির দিনের কলকাতার সকালটি বড়ো ভালো লাগলো শ্যামলীর।

মতি শীল স্ট্রীট আর ধরমতলার মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে সে হঠাৎ থমকে

দাঁড়ালো। রাস্তার অন্য ফুটপাথে রজত আর একটি পাঞ্জাবী মেয়ে হাত ধরাধরি করে পথ চলছে।

শ্যামলীর মনে কে যেন হঠাৎ একটা ব্রেক কষলো, ভীষণ ধাক্কা খেয়ে নিশ্চল হয়ে গেল সে। মনে পড়লো সকালে রজত তার কাছে দশটা টাকা ধার নিয়েছে, দিল্লির পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে চাকরির দরখাস্ত করবে বলে।

আর তারপর, আজ এই ছুটির দিনে রজত একটি পাঞ্জাবী মেয়ের সঙ্গে? ছুটির সকালের সমস্ত মাধুর্য ভুলে গেল শ্যামলী।

রজত শ্যামলীকে দেখেনি। ডলি দেশরাজের হাত ধরে সে ও ফুটপাথ থেকে বড়ো রাস্তা পেরিয়ে এ ফুটপাথে এলো। পাশ কাটিয়ে গেল শ্যামলীর। মনে হোলো কে যেন একটি মেয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে, কিন্তু সেদিকে রজত তাকালো না। যার সঙ্গে এত স্থন্দর-গড়ন প্রসাধনান্বিতা মেয়ে সে ফিরে তাকাবে পথের পাশে তাঁতের শাড়ি পরা একটি বাঙালী মেয়ের দিকে?

শ্যামলী নিজের মনে হাসলো একটুখানি।

রজত আর ডলি হেঁটে চলে গেল মতি শীল স্ট্রীট ধরে।

শ্যামলীকেও নিউমার্কেটে যেতে হবে এপথ দিয়ে। ওরা আরো অনেকটা এগিয়ে যাক, তারপর ;—শ্যামলী ভাবলো।

"শ্যামলী, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?"

ফিরে তাকিয়ে দেখে স্থজাতা'দি। শ্যামলী যে স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছে, এককালে সে স্কুলের এসিস্ট্যাণ্ট হেডমিস্ট্রেস ছিলেন।

শ্যামলীর সঙ্গে দেখা হোলো অনেক দিন পর। খুব খুশী।

"তারপর? এখনো শ্যামবাজারের সেই স্কুলেই পড়াচ্ছো?

"না, সে চাকরি চলে গেছে সম্প্রতি।"

"তাই নাকি? অন্য কোথাও যোগাড় করে নিতে পারলে?"

"এরই মধ্যে কি করে পারবো? গরমের ছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে।"

"তা'ও তো বটে। আচ্ছা, কলকাতার বাইরে হলে করবে?"

"কোথায়?"

"বেশী দূরে নয়, উত্তরপাড়ায়। তবে স্কুলে পড়ানো নয়। আমার মেশো-মশাইয়ের এক বন্ধু একটি ভালো মেয়ে খুঁজছিলেন ওঁর মেয়েকে পড়ানোর জন্যে। ওঁদের বাড়িতে থেকেই পড়াতে হবে। মেয়ে সামনের বছর ম্যাট্রিক দেবে। ওর মা নেই। ভালো মাইনে দেবে, যে কোনো স্কুলের মাইনের চেয়ে কম নয়—। যদ্দিন আর কিছু না পাচ্ছো, এটি করতে পারো।—"

শ্যামলী খুব উল্লসিত হোলো না। "আমার পক্ষে বাইরে থাকার তো অসুবিধে আছে। ভেবে দেখি।"

শ্যামলী দু'চার দিনের মধ্যেই জানাবে বলে কথা দিলো। অন্য দু'চারটি মামুলী কথাবার্তার পর চলে গেল সুজাতা'দি।

রজত আর পাঞ্জাবী মেয়েটি ততক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন ওরা শ্যামলীকে আর দেখতে পাবে না।

ওয়াছেল মোল্লার শো-কেস্‌গুলো বাঁয়ে রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো শ্যামলী। ভাবলো, রজত খেতে ফিরবে তো? হ্যাঁ, ফিরবে নিশ্চয়ই, নইলে সে বলে যেতো। বাইরে খেলে সে চিরকালই বাড়িতে বলে যায়। বাড়িতে বলা না থাকলে বাইরে খায় না কিছুতেই।

শ্যামলী ভাবতে ভাবতে চললো, কি খেতে ভালবাসে রজত।

রজত আর ডলি যাচ্ছিলো সাড়ে দশটার শো'তে লাইটহাউসে একটি ছবি দেখতে।

ডলি আস্তে আস্তে বললো, "জানো রজত, মতি শীল স্ট্রীটের মোড়ে একটি বাঙালী মেয়ে তোমার দিকে খুব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো।"

"আমায় তাকিয়ে দেখছিলো? বাঙালী মেয়ে? কি জানি, চেনাশোনা কেউ হবে হয়তো।"

"কোনো পুরোনো বন্ধু নিশ্চয়ই," ডলি বললে।

রজত বুঝলো ডলির মন কোন খাতে বইছে। উত্তর দিলো, "মেয়ে বন্ধু আমার কেউ কোনোদিন ছিলো না। ইউনিভার্সিটির কোনো পুরোনো ছাত্রী হবে হয়তো। দেখে চিনতে পেরেছ বলেই তাকিয়েছিলো।"

"বাঙালী মেয়েদের আমার ভালো লাগে না রজত—।"

"কেন?" রজত হাসলো একটুখানি।

"বাঙালী মেয়েরা মোটেও স্মার্ট নয়, বড্ডো বেশী সাদাসিধে, আর তাই নিয়ে ওদের খুব গর্ব," বললো ডলি দেশরাজ। "আমাদের সঙ্গে বেশী মিশতে চায় না।"

"স্মার্ট বাঙালী মেয়ে অনেক আছে, ডলি—।"

"ওরা আমাদের দেখে দেখে স্মার্ট হয়েছে।"

"তোমাদের দেখে দেখে কি রকম," একটু অবাক হোলো রজত।

"এই আমাদের দেখাদেখি বেশ ভালো মেক-আপ্ করে, আমাদের মতো ভালো ভালো রংচঙে রেয়ন বা সিল্কের শাড়ি পরে, খুব সুন্দর ফিট্ করা ব্লাউস পরে, চুল পার্ম করে, সাজ গোজ করে, ইংরেজি বলে। দু'একজনকে আমাদের মতো সালওয়ার কামিজও মাঝে মাঝে পরতে দেখেছি। সত্যি, তোমাদের তাঁতের শাড়িতে কী আছে বলো তো? তাঁতের শাড়ি আমার একটুও ভালো লাগে না, মেয়েদের চেহারা খোলে না তা'তে, একটুও স্মার্ট দেখায় না।"

রজত আস্তে বললো, "তুমি আমার দিদিদের দেখনি ডলি, তাই একথা বলছো। আমার একটি দিদি আছে, শ্যামলী তার নাম। সে ইংরেজিও বলে না, তাঁতের শাড়ি ছাড়া আর কিছু পরে না, মেক-আপ করে না, চুলও পার্ম করেনি। কিন্তু সে কি রকম স্মার্ট, ভাবতে পারবে না।"

"তোমার দিদি যখন, তখন স্মার্ট নিশ্চয়ই, তোমায় দেখেই সেটা আঁচ করতে পারছি," ডলি বললে, "কিন্তু এইমাত্র মতি শীল স্ট্রীটের মোড়ে একটি

তাঁতের শাড়ি পরা মেয়েকে দেখলাম, বেশির ভাগ বাঙালী মেয়েই ওর মতন, একটু স্মার্ট নয়।"

"ও রকম দু'একজন থাকবেই, ওদের কথা বাদ দাও", বললে রজত, "বাঙালী মেয়ে কতো স্মার্ট দেখে বোঝা যায় না, মিশে বুঝতে হয়। আর একটা কথা কি জানো, জমকালো সাজগোজ করা মেয়েদের বেশির ভাগই যে কতো ক্যাবলা, তা'ও দেখে বোঝা যায় না, মিশে বুঝতে হয়।"

ডলি দেশরাজ হাসলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কলেজের মেয়েরা কি খুব স্মার্ট ?"

রজত একটু অবাক হোলো। "আমার কলেজ ?"

"যে কলেজে তুমি পড়াও।"

"ও," রজত একটু বিবর্ণ হোলো। ডলির কাছে নিজের দাম বাড়াতে এই বানানো কথাটি বলবার মতিভ্রম তার কেন যে হয়েছিলো! এখন সেটা কি করে কাটিয়ে ওঠা যায় ভেবেই পেলো না। কোনো দরকার ছিলো না একথা বলবার।

একবার ভাবলো, বলেই ফেলি সত্যি কথাটি।

তারপর ভাবলো, না, আজ থাক, আজ সিনেমা দেখি, মিষ্টি মিষ্টি দু'চারটি কথা বলি, আর দু'চারটি শুনি। তারপর অন্য কোনো একদিন সময় মতো বলা যাবে।

সিনেমা দেখে, চৌরঙ্গি পাড়াতেই একটি শৌখিন রেস্তরাঁয় খাওয়া দাওয়া সেরে নিলো। তারপর মধুময় দুপুরটি ডলির সঙ্গে কাটিয়ে বাড়ি ফিরে এলো বেলা তিনটেয়।

এসে শ্যামলীকে বললো, সে এ বেলা আর খাবে না।

শ্যামলী তখনো না খেয়ে বসেছিলো ওর জন্যে।

॥ চার ॥

প্রবাল মুখার্জি হরিদাসের জন্যে মেয়ে দেখতে গিয়েছিলো এক শনিবার সন্ধ্যায়। তারপর সাতটা দিন খুব ব্যস্ত রইলো নানা কাজের ভিড়ে। আরেকটি শনিবার ঘুরে এলো। তার মনে হোলো এবার একবার খবর নেওয়া দরকার সেই মেয়েটির চাকরির কি হোলো।

কি যেন মেয়েটির নাম? মৃ......রুপালী! বেশ মিষ্টি নাম, প্রবাল ভাবলো।

সেদিন সন্ধ্যায় সে বেড়াতে এলো সুমিতাদের বাড়ি।

পানামা কোল্ড স্টোরেজ এ্যাণ্ড রেফ্রিজারেটার্স লিমিটেড্-এর পাব্লিক রিলেশান্স ম্যানেজার ছিলো সুমিতা গুহ। বিলেত থেকে ফিরে এসে এখানেই চাকরি করছিলো সে। তাকেই প্রবাল বলে রেখেছিলো রুপালী সেনের কথা।

"কি খবর? এদ্দিন শ্রীমানের দেখা নেই কেন," জিজ্ঞেস করলো সুমিতা। "নেমন্তন্ন না করলে বুঝি আসবার নামটি করতে নেই?"

"নেমন্তন্ন?"

"মানে? তুমি আমার চিঠি পাওনি?"

"না তো! কখন পাঠিয়েছিলে?"

"বিকেল বেলা। বাহাদুরের সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি?"

"না—। সেই যে সকালে বেরিয়েছি, আর তো বাড়ি ফিরিনি। সোজা এখানে চলে এলাম।"

"তা'হলে? তুমি এমনি এমনি এসেছো?"

"হ্যাঁ—।"

"আমার কুশল জানবার জন্যে?"

"তা ছাড়া আবার কি? তবে হ্যাঁ, একটি খবরও নেওয়ার ছিলো—।"

"ও, তাই বলো। শুনি, কি ভাবে তোমায় অনুগৃহিত করতে পারি—।"

"সেই যে মেয়েটির কথা বলেছিলাম, সে গিয়েছিলো তোমার কাছে?" প্রবাল জিজ্ঞেস করলো।

সুমিতা হাসলো। বললো, "কে, রুপালী? আচ্ছা, এই সহজ মেয়েটিকে তুমি আবিষ্কার করলে কোথায়? আমার যে ভীষণ ভালো লেগেছে ওকে—।"

"চাকরিটা দিয়েছো?"

"না, আমার পি-এ'র কাজটি দিতে পারলাম না। ও তো শর্টহ্যাণ্ড জানে না।"

"দিতে পারলে না?" প্রবাল হতাশ হোলো।

"আরেকটি কাজ দিয়েছি," সুমিতা বললে, "আমার ডিপার্টমেণ্টেই। খুশী হলে এবার?"

"খুশী? হ্যাঁ, তা' একটু হয়েছি বৈ কি। তোমায় তো বলেইছি সেদিন, মেয়েটি বাপ-মায়ের পছন্দ করা ছেলে বিয়ে করবে না, সে চাকরি করবে, তার এই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছেটা বড়ো ভালো লাগলো। তাই তোমায় এসে বললাম।"

"মেয়েটি এবার কাকে বিয়ে করবে?" সুমিতা জিজ্ঞেস করলো।

"যাকে সে নিজে পছন্দ করবে," প্রবাল বললো।

"বেচারী!"

"কেন?"

"নাঃ, এমনি বললাম। মেয়েটি বড্ড ভালো।" একটু চুপ করে থেকে সুমিতা বললে, "মেয়েটি ঘরে ঢুকে আমায় দেখে অবাক। বাঙালী মেয়ে অফিসার, সে আশা করেনি।"

প্রথম সুমিতার সঙ্গে দেখা করতে এসে স্প্রিং এর দরজা ঠেলে

আশঙ্কা-থর-থর মনে ঘরের ভিতর ঢুকে রুপালী সত্যিই খুব অবাক হয়েছিলো।

মস্তো বড়ো সেক্রেটারিয়েট টেবিলের পেছনে বসে যে একটি বাঙালী মেয়ে সেটা সে আশা করতে পারেনি। প্রবাল কার্ডে লিখে দিয়েছিলো শুধু—এস্-গুহ, পি-আর-এম, পানামা কোল্ড-স্টোরেজ এ্যাণ্ড রেফ্রিজারেটার্স লিমিটেড। ঘরে ঢোকবার সময় দরজার উপর নামের প্লেটটিও সে খেয়াল করে দেখেনি। বেরুবার সময় দেখে নিলো, হ্যাঁ, নামের আগে মিস্ লেখা আছে বটে, মিস্ এস্ গুহ।

সুমিতা তাকে একটি চেয়ার দেখিয়ে বলেছিলো, "বসুন।"

বেশ মিষ্টি গলা, অথচ গুরুগম্ভীর। রুপালীর মনে হয়েছিলো, কলরবময় টিফিনের পর এ যেন ক্লাস বসানোর ঘণ্টা পড়লো। একটি ফাইল নিয়ে ব্যস্ত ছিলো সুমিতা। নিস্তব্ধ ঘরে বসে রুপালী ভালো করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো সুমিতাকে। বয়েস প্রায় তিরিশ হবে, মেয়েদের চোখ দিয়ে বুঝলো রুপালী, কিন্তু শরীরের কাঠামো এখনো শক্ত, দেহের জ্যামিতি এখনো অষ্টাদশীর মতো নিখুঁত, নবোঢ়ার মতো টলমলো। মুখটি ভালো নয়, শ্যামলা রঙে পাউডারের ফ্যাকাশে আভাস, দুপাশের গালে দু'চারটে ব্রণ রুক্ষতার মাধুর্য এনেছে সে মুখের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্যে। অদ্ভুত কালো একজোড়া চোখ সুমিতার, বড়ো বেশী দীর্ঘ, বড়ো বেশী গভীর, বড়ো বেশী সন্ধানী।

"আপনার কথা প্রবাল আমায় বলছিলো," ফাইলটি এক পাশে সরিয়ে রেখে সুমিতা প্রথম কথা বললো।

সুমিতা থামতেই রুপালীর মনে হয়েছিলো তারও কিছু বলা উচিত। কি বলবে ভেবে না পেয়ে বললো, "আপনার কথাও প্রবাল বাবু আমায় বলছিলেন।"

"তাই বুঝি।" সাধনা চোখ তুলে তাকিয়েছিলো রুপালীর দিকে। তারপর হেসে ফেলেছিলো।

রুপালী কি জানি কেন একটু অপ্রস্তুত বোধ করলো। তারপর অকারণে হেসে ফেলেছিলো নিজেও।

চাকরি ঠিক হয়ে গিয়েছিলো দু'চার কথায়।.........

"তারপর এই ক'দিনে একবারও আসবার সময় করে উঠতে পারলে না?" সুমিতা বলে চললো, "এদিকে অনেক গণ্ডগোল চলছে। তোমার সঙ্গে কথা আছে অনেক। সে পরে হবে'খন। আরেকজন অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্যে। বেচারীকে বসিয়ে রেখেছি অনেকক্ষণ, তুমি এলে বাড়ি পৌঁছে দেবে বলে। নাও, ওঠো। রুপালীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো তো!"

"রুপালী?" প্রবাল অবাক হোলো।

"হ্যাঁ, ও জিজ্ঞেস করছিলো তোমার দেখা পাওয়া যাবে কোথায়। তোমায় নাকি ওর দরকার। তাই অফিস ফেরত ওকে এখানেই নিয়ে এলাম।"

"কোথায় সে?"

"ভেতরে, খাওয়ার ঘরে বসে গল্প করছিলাম চা খেতে খেতে, তোমার বেল শুনে ওকে বসিয়ে রেখে উঠে এসেছি, আর ইতিমধ্যে ভুলেই গেছি ওর কথা।"

ডাক শুনে রুপালী এলো।

সুমিতা প্রবালকে বললো, "ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আবার চলে এসো এখানে। খাওয়ার কথা ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে, ফিরতে দেরি কোরো না। মনে থাকে যেন নেমন্তন্নটা রাত্তিরে খাওয়ার, কাল সকালের চায়ের নয়—।"

রুপালীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো প্রবাল মুখার্জি। যাওয়ার আগে সুমিতাকে একবার ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলো সে। তার চোখ দুটি সহজ নিঃশঙ্ক, মুখখানি গ্ল্যামোর বিজ্ঞাপনের মতো। ফ্যানের হাওয়ায় কয়েকটি চুল উড়ে কপালের উপর এসে পড়ছে।

ফিরে এসে চুলগুলি সরিয়ে দেবো, প্রবাল ভাবলো।

পথে যেতে যেতে রুপালী বললো, সে কেন খোঁজ করছিলো প্রবালের।

"দিদি আপনাকে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন কাল তুপুর বেলা।"

"নেমন্তন্ন! কেন?"

"বা—রে, আপনি আমার আমার চাকরি করে দিলেন, আমাদের নিজের হাতের রান্না খাওয়ানো ছাড়া আপনার জন্যে আর কি করতে পারা আমাদের সামর্থ্যে কুলোবে বলুন।"

হাসলো প্রবাল।

"চাকরি হোলো আপনার, আর খেতে বলেছেন আপনার দিদি?"

চোখ তুলে প্রবালের দিকে তাকালো রুপালী।

"আমাদের বাড়ির সব নেমন্তন্ন তো দিদিই খাওয়ায়। আপনি আসবেন তো?"

সহজ ছেলেমানুষির কাঁচা স্নিগ্ধতা একটু তুলিয়ে দিলো প্রবালের মন।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবো।"

প্রবালকে খুব যত্ন করে খাওয়ালো শ্যামলী আর রুপালী।

রজত প্রথমটা আসতে চায়নি এদের মধ্যে। শ্যামলীকে বলেছিলো, "এর মধ্যে আমি থেকে কি করবো বলো? এ হোলো যারা চাকরি দেয় এবং যারা চাকরি পায় তাদের পার্টি—।"

"পুরুষ মানুষ একজন কেউ না থাকলে উনি কি মনে করবেন?"

"কিচ্ছু মনে করবেন না। কেউ থাকলেই বরং কিছু মনে করার সম্ভাবনা বেশি।"

শ্যামলী একটু হাসলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "আচ্ছা, উনি না হয় কিছু মনে নাই করলেন, কিন্তু রুপু কি ভাববে বলতো?"

রজত চুপ করে রইলো।

শ্যামলী বললো, "রুপু চাকরি পেলো বলে তুই যদি—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। উঃ, মেয়েদের মনে এত প্যাঁচ—।"

শ্যামলী হাসতে লাগলো। "ভদ্রলোকের সঙ্গে ভালো করে আলাপ করে রাখ। হয়তো ওঁকে খাওয়ানোর সুযোগ একদিন তোরও হতে পারে—।"

রজত বললে, "ওঁর পয়সা কড়ি কিছু আছে, না?"

"কি জানি, হয়তো আছে।"

"ঠিক আছে। আলাপ করে রাখি, মাঝে মাঝে টাকা ধার নেওয়া যেতে পারে—।"

শ্যামলীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। "ধার? ওঁর কাছ থেকে? খবরদার, এ কাজ করবিনে—।"

"কেন? টাকা মারা গেলে ওঁর যাবে, তার জন্যে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?"

"কি বলছিস রজত? উনি আমাদের উপকার করলেন, আর তোর মাথায় এসব বদ মতলব খেলছে?"

"বদ মতলব ছাড়া সোজা রাস্তায় তো পয়সা করবার উপায় দেখছি না। উনি যখন রুপুকে গায়ে পড়ে চাকরি পাইয়ে দিলেন, তখন ওঁরও নিশ্চয়ই কোনো মতলব আছে। কাঁঠাল ভাঙতে হলে এসব লোকের মাথাই সব চেয়ে সুবিধেজনক।"

"খবরদার, ওঁর কাছে কোনোদিন টাকা চাইতে পারবি না—।"

"বেশ, চাইবো না যদি তুমি—।"

"যদি আমি কি?"

"যদি তুমি আমায় এখন পাঁচটা টাকা ধার দাও।"

"গত রোববার দশ টাকা নিলি। আজ আবার পাঁচ দিলে আমার চলবে কি করে শুনি?"

"বেশ, তোমার টাকা দিয়ে তুমি চালাও। আমি ওঁর টাকা দিয়ে চালাই। আজকের তিথিটা ভালো। আজই শুরু হোক—।"

"রজত— !"

রজত নির্বিকার ভাবে সিগারেট ফুঁকতে লাগলো।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো শ্যামলী। তারপর বললো, "রজত, তুই আস্তে আস্তে গোল্লায় যাচ্ছিস।"

রজত আরো তুটো টান দিলো সিগারেটে। তারপর বললো, খুব নরম গলায়, কিন্তু হাসি মুখেই, "সত্যি ছোড়দি, আমি আস্তে আস্তে গোল্লায় যাচ্ছি।"

শ্যামলী মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একটু পরে ফিরে এসে পাঁচ টাকার একটি নোট দিয়ে বললো, "এ মাসে আমার কাছে আর টাকা চাসনে, আমার হাতে টাকা নেই।"

উমাকান্ত খেতে বসেছিলেন এদের সঙ্গেই। খাওয়া দাওয়ার পর চলে গেলেন ঘুমুতে।

প্রবাল বললো, "রোববারের দিনটা মাংস ভাত দই মিষ্টির মধ্যেই শেষ করতে চাই না। সারা তুপুর আর বিকেলটি আমার কিছু করবার নেই। যদি আপনারা সবাই আমার সঙ্গে সিনেমায় যাওয়ার আর তারপর কোথাও বসে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন তো খুব খুশী হবো।"

রজত বললে, "আমার নিমন্ত্রণটা তোলা থাকলো প্রবাল দা'। আমি ইতিমধ্যে একদিন আপনার বাড়ি যাবো। আজ আমার অন্য এক বন্ধুর বাড়ি চায়ের নেমন্তন্ন আছে। আমায় বেরুতে হবে একটু পরেই।"

শ্যামলী বললে, "আজ না হয় বন্ধুর বাড়ি নাই বা গেলি—।"

"সে হয় না ছোড়দি, কথা দেওয়া আছে।"

শ্যামলী মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হোলো।

"বেশ, চলো ছোড়দি, আমি আর তুমি যাই," রূপালী বললে।

শ্যামলী রাজী হোলো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রূপালীর যাওয়া হয়ে উঠলো না। নীরজা আপত্তি জানালেন শ্যামলী গিয়ে বলতেই। শ্যামলীর বিয়ের আশা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু রূপালীর জন্যে এখনো আশা রাখেন, তাই বাইরের একটি ছেলের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাওয়াটা তিনি খুব বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না।

শ্যামলীকে বললেন, "তুই একাই যা। রূপালী যদি এ ভাবে পরের সঙ্গে সিনেমা দেখতে আরম্ভ করে নানান জনে নানা কথা বলবে। আজ না হোক, দু'দিন পরে হলেও ওর বিয়ে একটা দিতে হবে তো! ও যে চাকরি করতে গেল তাই আমার ভালো লাগেনি।"

"প্রবাল বাবু খুব ভালো লোক, মা," শ্যামলী ক্ষুন্ন হয়ে বললো।

"তাই তো তোকে একাই যেতে বলছি।"

শ্যামলী এসে প্রবালকে বললো, "চলুন, আমি আর আপনি যাই। রূপালীকে নিয়ে মা কোথায় যেন যাবেন বলছেন।"

প্রবাল মুখার্জি মনের কপালে করাঘাত হানলো। সর্বনাশ, শুধু শ্যামলী একা? যাক, কিছু করবার নেই, নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

সন্ধ্যের পর শ্যামলীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে প্রবাল এলো সুমিতার কাছে।

"কি রকম খাওয়ালো," জিজ্ঞেস করলো সুমিতা।

প্রবাল হাসলো। "ভালোই খাইয়েছে। বেশ রাঁধে মেয়ে দুটো।"

"আমার চেয়েও ভালো?"

"তোমরা মেয়েরা কী হিংসুটে," প্রবাল বললো, "তোমার খাওয়ানো আর ওদের খাওয়ানো কি একই কথা হোলো?"

"এই সামান্য কথায় যে তুমি চটে যাচ্ছো বাচ্চা ছেলের মতো, তাতেই আমার হাসি পাচ্ছে," সুমিতা বললো। "তোমার কি ধারণা কারো বাড়ি

গিয়ে তুমি খেলে বা কাউকে সিনেমায় নিয়ে গেলে আমি চোখে অন্ধকার দেখবো? কোন্ ছবিটা দেখলে?"

প্রবাল টেনিস বল্-এর মতো লাফিয়ে উঠলো।

"তুমি কি করে জানলে?"

"দুপুরে বেরিয়েছিলাম। লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ে দেখি তুমি ট্যাক্সি চেপে যাচ্ছো বেশ ভালো দেখতে একটি মেয়ের সঙ্গে। তিনটে নাগাদ ওপাড়ায় সিনেমা দেখতে যাওয়া ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?"

"মেয়েটির রুপালীর দিদি, শ্যামলী।"

"আমি জিজ্ঞেস করবার আগেই বলে ফেললে? বেশ। রুপালীকেও সঙ্গে নিলে না কেন?"

"বলেছিলাম। ও আসেনি। ওর অন্য কোথায় যেন যাওয়ার কথা ছিলো ওর মায়ের সঙ্গে।"

"ওর মাকে বেশ বিচক্ষণ ভদ্রমহিলা বলে মনে হচ্ছে। শ্যামলীর সঙ্গে আবার কখন দেখা হবে তোমার?" সুমিতা জিজ্ঞেস করলো।

প্রবাল একটু চুপ করে থেকে তারপর তাকালো সুমিতার দিকে। তারপর বললে, "দেখা খুব শিগ্‌গির আর হবে বলে মনে হয় না। শ্যামলী তিন চার দিনের মধ্যেই উত্তরপাড়ায় চলে যাচ্ছে কাদের বাড়ির মেয়ের যেন গার্জিয়ান টিউটার হয়ে।"

"তাই বুঝি," সুমিতা হাসলো। "শ্যামলী আর কি কি বললো তোমায়?"

প্রবালও হাসলো।

সে ঠিক ওই ধরনের লোক, যাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, যাদের সঙ্গে প্রথম আলাপেই সবাই অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠতে চায়, ছেলে কি মেয়ে সবাই, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজের সম্বন্ধে অনেক কিছুই গল্প করে শোনায়, ওর সম্বন্ধে কিছু জানবার আগ্রহ প্রকাশ না করেই।

যে কোনো লোকের মনে বিশ্বাস অনুপ্রেরিত করবার অদ্ভুত ক্ষমতা প্রবাল মুখার্জির।

তাই নিয়ে সব সময় ওর পা মোচড়াতো সুমিতা গুহ।

"শ্যামলী কি বললে? সব মেয়ে যা বলে থাকে, বয়েসটা একটু বেশী হয়ে গেলে," প্রবাল উত্তর দিলো। "এই ধরো যেমন, দুনিয়াটা ভালো জায়গা নয়, সবাই স্বার্থপর, এখানে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না—"

"—এক মাত্র তোমাকে ছাড়া।"

প্রবাল হেসে ফেললো। "শ্যামলীর উপর একটু অবিচার করছো সুমিতা।"

সুমিতা সে কথার উত্তর দিলো না। শুধু বললে, "বেচারী রুপালী!"

"সে কথা কেন বলছো?"

"তোমার কে যেন উত্তরপাড়ায় থাকেন শুনেছিলাম।"

প্রবাল হেসে ফেললো, "সেখানে আমি খুব কমই যাই। বছরে একদিন কি দু'দিন। তবে উত্তরপাড়ায়-যাচ্ছে তো শ্যামলী। রুপালীর নাম করলে কেন?"

"মেয়েরা কোনো কিছুই নিঃস্বার্থ পরোপকার হিসেবে নেয় না বলে—।"

"মানে—?"

"সময় হোক, বলবো একদিন।"

প্রবালের মিনিট দুই মাথা চুলকানো নিষ্ফল হোলো।

॥ পাঁচ ॥

শ্যামলী উত্তরপাড়ায় চাকরি নিলো রজত সম্বন্ধে হতাশ হয়ে। তা' নইলে কিছুদিন বেকার বসে থেকে হলেও কলকাতার উপরই কোনো স্কুলে সামান্যতম মাইনের চাকরির চেষ্টাই সে করতো।

কিন্তু দেখলো যে রজতকে দিয়ে সংসারের কোনো উপকার হওয়ার আশা নেই। বাপের আয়ের বেশির ভাগই চলে যায় এদিক ওদিক কয়েকটি দেনা মেটাতে। বাদবাকি যা থাকে তার সঙ্গে রুপালীর আয় জুড়লেও সংসার ঠিক মতো চলবে না। এতদিন তবু মাসের পর মাস আশা করেছিলো রজতের একটা কিছু হয়ে যাবে। যেদিন দেখলো যে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে দরখাস্ত পাঠানোর টাকা পকেটে নিয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি পাঞ্জাবী মেয়ের সঙ্গে, সেদিন সে রজত সম্বন্ধে নিরাশ হোলো। চাকরি পেলে সে যে আর বাপের সংসারে থাকবে না এটা বুঝে নিলো শ্যামলী। তাই উত্তরপাড়ার কাজটি হাতে আসতেই নিয়ে নিলো।

চাকরি এক ধনী জমিদারের বাড়িতে। বাড়ির কর্তা বিপত্নীক, বয়েসও হয়েছে। একমাত্র মেয়ে, আগামীবার প্রাইভেট ম্যাট্রিক দেবে। তাকে পড়ানো। থাকতে হবে তাঁর বাড়িতেই।

নতুন আবহাওয়াটি খুব পছন্দ হয়ে গেল শ্যামলীর। বাড়িটি যতো বড়ো, সংসারটি ততো ছোটো। বাপ, মেয়ে, মেয়ের বিধবা পিসি আর দু'চারজন ঝি-চাকর। একটি নির্ঝঞ্ঝাট নিরুপদ্রব সংসার। সবাইকে দুদিনেই আপন করে নিলো শ্যামলী।

একটি নতুন সোয়াস্তিতে ভরে উঠলো তার দিনগুলো। সকালে সন্ধ্যায় ঘণ্টা তিন চার মেয়েটিকে পড়ানো, দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর কর্তামশায়ের লাইব্রেরিতে বসে এ বই ও বই বেছে নিজের ঘরে নিয়ে এসে পড়া,

আর বিকেল চা খেতে খেতে সবার সঙ্গে বসে গল্প করা। কোনো ভাবনা চিন্তা নেই, ঝঞ্ঝাট নেই, ঝামেলা নেই, নিজের কোনো আজেবাজে খরচাও নেই।

রোববার রোববার শুধু কলকাতা গিয়ে নিজেদের বাড়ি বেড়িয়ে আসা।

রূপালী আর উমাকান্ত উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতেন শ্যামলীর জন্যে। নীরজা কারো ধারে কাছে খুব বেশী ঘেঁষতেন না। মেয়ে যে মাস্টারনী হয়ে পরের বাড়ি থাকে এতে খুব মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন তিনি।

শুধু দেখা হোতো না রজতের সঙ্গে। রোববার বাড়িতে সে থাকতোই না। কোথায় যায় ছেলেটা!—বলাবলি করতো সবাই।

শ্যামলী আঁচ করতে পারতো। কিন্তু কাউকে কোনোদিন কিছু বলেনি।

বাপকে একদিন বললে, "তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে বাবা। একটু যত্ন নাও।"

নীরজা শুনতে পেয়ে বললেন, "কে আর যত্ন নেবে। দিনরাত আমায় পড়ে থাকতে হয় রান্নাঘরে। ছেলে বড়ো হয়েছে। কিন্তু কোনো খোঁজ নেয় না সংসারের। বলি, বিয়ে দিয়ে দাও ছেলের। বাড়িতে বৌ এলে ছেলের মতিগতি ফিরতো। তোমরা ওর জন্যে কেউ গা করো না বলেই ও এরকম বিবাগী হয়ে যাচ্ছে। বৌ এলে আমাকেও খাটতে হবে না। ওঁরও কোনো অযত্ন হবে না। তা'তো নয়। আমি হেঁসেলে পড়ে থাকলেই সবার আনন্দ। মেয়েরা করবে চাকরি। ছেলে বাউণ্ডুলে হয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবে। ওঁর শরীর কোত্থেকে ভালো থাকবে শুনি?"

সেদিন থেকে শ্যামলী সংসারের কোনো ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্নই তুলতো না। শুধু মাস গেলে মাইনের একটি মোটা অংশ এনে তুলে দিতো বাপের হাতে।

অফিসের আবহাওয়ায় রূপালীর মন পরিশ্রান্ত হয়ে উঠলো ক্রমশ।

কর্মচারিদের ভিড়ের মধ্যে বসে নিজের সম্বন্ধে মনে হোতো এ যেন বনের হরিণকে এনে চিড়িয়াখানায় জালে ঘেরা একটুকু জায়গার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া। এতদিন হাজার অসুবিধে আর অভাবের মধ্যেও একটা স্বাধীনতা ছিলো, এবার বাঁধা রুটিনে জীবন আটকে গেছে। একই কাজের দৈনন্দিন পুনরাবৃত্তি, নিজের মনকে পরের খেয়াল আর খুশির প্রয়োজনে সজাগ রাখা, মাসপয়লার সাময়িক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রত্যাশায়। তবু লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই করে চলেছে, এই করে যাবেও আরো অনেক বছর। আর সে নিজেও যখন একটি সাধারণ মানুষ হয়ে জন্মেছে, একটি অতি সাধারণ ঘরে, তখন এর চেয়ে বেশী কীই বা প্রত্যাশা করে সে, রুপালী ভাবলো। এই ভেবে নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে নিজের কাজ করে যেতো সে। শুধু মাঝে মাঝে মনে পড়তো রজতের কথা। রুপালীরও চাকরি জুটে গেল, শ্যামলীও নিজের আয়ে চলে—শুধু রজতই কিছু করে উঠতে পারলো না এখন পর্যন্ত।

একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতো রুপালী, তারপর এসব কথাও ভুলে যেতো কাজের দ্রুততায়।

রজত একদিন ডলি দেশরাজকে আধা-সত্যি বলেই ফেললো।

"ডলি, আমার প্রফেসারিটা আর নেই, জানো ?"

"সে কি ! ছাড়িয়ে দিয়েছে ?" ডলি চোখ কপালে তুললো। "কেন ?"

"একজনের লীভ ভেকেন্সিতে ছিলাম। সে ফিরে এসেছে।"

"অন্য কোনো কলেজে কাজ পাবে না ?"

"পাবো নিশ্চয়ই, কিন্তু ভাবছি প্রফেসারি আর করবো না—।"

"কেন ?" জিজ্ঞেস করলো ডলি।

"মোটে দেড়শো টাকা মাইনে। এতে কি তোমার আমার সংসার চলবে ?"

"কেন চলবে না," ডলি বললো, "তোমার মাইনে আর আমার মাইনে মিলে যা হবে তাতে ঠিক চলে যাবে।"

"কিন্তু তোমায় বিয়ে করবার পর আমি তোমায় চাকরি করতে দেবো কেন?"

"অনেকেই তো করে—।"

"করুক গে। আমি ঠিক একটি যোগাড় করে নেবো। তুমি সংসার দেখাশুনো করবে। আমি অফিস থেকে ফিরলে আমায় চা করে দেবে—।"

ডলি দেশরাজের চোখ দুটো স্বপ্নালু হয়ে এলো। তার কতোদিনকার ঘুম-ভাঙা নিঃসঙ্গ শেষ-রাত্তিরের কামনা·········সিঁড়িতে জুতোর শব্দ······ ঘড়িতে বিকেল পাঁচটা·········দরজার বেল বাজবে·········ছুটে এসে দরজা খুলে দেবে ডলি·········সে এসে ঘরে ঢুকে তার গাল দুটো টিপে দেবে।······ পাশের ঘরে দোলনায় মেয়েটি কেঁদে উঠবে ·········

ডলির মুখ একটু লাল হোলো। ঈষৎ হেসে সে ফিরে এলো মাটির পৃথিবীতে।

বললে, "আমাদের অফিসে লেবার ডিপার্টমেণ্টে লোক নিচ্ছে, জানো? তুমি একবার চেষ্টা করবে? পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই—।"

"তোমাদের অফিসে? পানামা কোল্ড স্টোরেজ-এ? দাঁড়াও, আমার একজন চেনা লোক আছে, তার এক বন্ধু সেখানে চাকরি করে—।"

"আমি নিজে একবার ডিরেক্টারকে বলতে পারি।"

"কে তোমাদের ডিরেক্টার?

"শেঠ কিশোরীলাল। ব্লু-ওয়েদার এ্যাণ্ড চেস্টারটন লিমিটেডের শেঠ রতনলালের ভাই—।"

"তাই নাকি? ব্লু-ওয়েদার এ্যাণ্ড চেস্টারটনের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক?"

"সব একই গ্রুপের কোম্পানী। ওরা আমাদে ম্যানেজিং এজেন্ট।"

"আচ্ছা—! দেখা যাক একবার চেষ্টা করে," রজত বললো। দীপালীর বর ওদের ডিরেক্টার হয়েছে, সেদিন দাপালী বলছিলো। আশার আলো দেখতে আরম্ভ করলো রজত।

"আমি শেঠ কিশোরীলালকে বলবো? আমার সঙ্গে চেনা আছে—"

"না, থাক তুমি বোলো না। তোমার কথা সে না'ও রাখতে পারে—।

"তা'হলে?"

"আমি নিজেই গিয়ে ধরবো আমার বন্ধুর বন্ধু সেই অফিসারটিকে। সব কিছু নিজের ইনিশিয়েটিভে করা ভালো, কি বলো ডলি। একে ওকে তাকে ধরবার চেষ্টা করলে লোকের ইম্‌প্রেশান খারাপ হয়ে যায়। নিজের যখন কোয়ালিফিকেশান আছে তখন আমি কেন এর কাছে ওর কাছে সাধাসাধি করতে যাবো। স্মার্ট ছেলেরা নিজের কাজ নিজে যোগাড় করে, যাদের অন্য কোনো কোয়ালিফিকেশান নেই তারাই যায় নিজের বড়লোক আত্মীয়-স্বজনের সুপারিশ যোগাড় করতে।"

ডলি সপ্রশংস চাউনির মধু ঢেলে দিলো রজতের মুখের উপর।

রজত সময় নষ্ট করলো না। সেদিনই বিকেলবেলা চলে এলো রেইনী পার্কে মোহিত চ্যাটার্জির বাড়ি।

বাইরের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলো মোহিত, দীপালী আর ক্ষমা। রজতকে দেখে ক্ষমা উঠে চলে গেল। রজতের সঙ্গে ও কথাবার্তা কোনো-দিনই বলে না। প্রয়োজন মনে করে না বলেই বলে না। যে ধরনের লোক নিয়ে ক্ষমার নিজের পৃথিবীর জনতা রজত তাদের মধ্যে কেউ নয়, হবে বলে মনে করবারও কারণ নেই।

এর আগে একদিন দীপালী বলেছিলো, "উঠছো কেন ক্ষমা, বোসো না—।"

"অঞ্জলীকে টেলিফোন করতে হবে," বলেছিলো ক্ষমা।

উঠে যাওয়ার পর আর ফিরে আসেনি রজত চলে না যাওয়া পর্যন্ত।

তারপর থেকে দীপালী ওকে আর কোনোদিন কিছু বলেনি।

রজতকে দেখে দীপালী এক কাপ চা ঢেলে এগিয়ে দিলো।

"বাবার শরীর কি রকম ?"

"ভালোই, তবে ভেঙে পড়ছেন আস্তে আস্তে। শিগ্‌গির রিটায়ার করতে হবে।"

"দেখি আজকালের মধ্যে একদিন যাবো," দীপালী বললো।

আজ কালের মধ্যে যাওয়ার সঙ্কল্প বহুদিন ধরেই প্রকাশ করছে দীপালী। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে উঠছে না।

রজত কিছু বললো না।

"শ্যামলী উত্তরপাড়াতেই আছে ?"

"হ্যাঁ।"

"সেদিন শ্যামলীকে হাওড়া স্টেশন থেকে বেরুতে দেখলাম," মোহিত বললো।

"তুলে নিয়ে এলে না কেন ?"

"গাড়িতে মিস্টার তিওয়ারি ছিলো।"

"রুপালী সেই চাকরিই করছে ?" দীপালী জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, এইতো মাসখানেক হোলো জয়ন্ করেছে।"

"কোথায় চাকরি করছে," জিজ্ঞেস করলো মোহিত।

"কোন্ একটা ছোটো ফার্মে যেন করছে, আমি নাম জিজ্ঞেস করিনি একদিনও।"

কোম্পানির নামটি ভাঙলো না রজত। কী দরকার মোহিতকে জানিয়ে যে রুপালী ওদের গ্রুপের একটি কোম্পানির সাধারণ কেরানী। রুপালীর সঙ্গেও ওর দেখা হবে না কোনোদিন, এত বড় ফার্ম, সাধারণ কেরানী আর ডিরেক্টারদের মধ্যে মোলাকাত হবে না।

কিছুক্ষণ আজে বাজে দু'চারটা কথা।

তারপর মোহিত জিজ্ঞেস করলো, "কোথাও কিছু সুবিধে করতে পারলে?"

রজত বললো, "এ ব্যাপারেই আপনার কাছে এলাম।"

"তাই নাকি?"

"আপনাদের পানামা কোল্ড্ স্টোরেজ এ্যাণ্ড রেফ্রিজারেটার্স-এর ফ্যাক্টরিতে দু'একজন এসিস্ট্যান্ট্ লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নিচ্ছে। আপনি যদি বলেন তো এপ্লাই করে দিই।"

মোহিত চিবুক কণ্ডূয়ন করলো।

তারপর বল্ল, "তা' করে দিতে দোষ নেই, তবে তুমি পাবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তোমার ডিগ্রি ফিলসফিতে, ওরা চায় ইকনমিক্স বা আইনের গ্র্যাজুয়েট। তার উপর তোমার লেবার ওয়েলফেয়ারের ডিপ্লোমা নেই।"

রজত বললো, "লেবার ওয়েলফেয়ারের ডিপ্লোমা তো এমনি এমনি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে পাওয়া যায় না। কোনো কোম্পানীর লেবার ডিপার্টমেণ্টে থাকলে, সেই কোম্পানীর মারফত চেম্বার অফ কমার্সের রিকমেণ্ডেশান নিয়ে তবে লেবার ওয়েলফেয়ার কোর্স পড়া চলে।"

"হ্যাঁ, ওসব নানারকম কমপ্লিকেশান আছে—।"

"লেবার ওয়েলফেয়ারে ডিগ্রি না থাকলে ওয়েলফেয়ার অফিসারের চাকরি পাবো না, অথচ লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের চাকরিতে না থাকলে লেবার ওয়েলফেয়ার কোর্সে ভর্তি হতে পারবো না। এখন কি করি বলুন তো?"

"পুণায় অবশ্যি এমনিতেই ভর্তি হওয়া চলে," বললো মোহিত চাটার্জি

রজতের গা জ্বলে উঠলো। এ ধরনের লোকগুলো মাঝে মাঝে এমন ক্যাবলার মতো কথা বলে—!

"পুণায় গিয়ে পড়া তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"হ্যাঁ, তোমার তো অসুবিধে আছে অনেক। মুশকিল কি জানো? তোমার তো কোনো কাজের অভিজ্ঞতা নেই। আজকাল অভিজ্ঞতা না থাকলে কাজ পাওয়া শক্ত।"

"কিন্তু কোথাও আরম্ভ না করলে অভিজ্ঞতা কোত্থেকে হবে বলুন?" রজত জিজ্ঞেস করলো মনের বিরক্তি চেপে।

দীপালীর দিকে ফিরে মোহিত বললো, "দীপালী, ফাইভ ইয়ার প্ল্যান সম্বন্ধে কি বলা হচ্ছে কাগজে পড়ছো?"

দীপালী ঘাড় নাড়লো।

মোহিত বলে চললো, "দেশে আর বেকার সমস্যা থাকবে না।—সত্যি, রজতের মতো ছেলেদের দেখে খুব দুঃখ হয়।"

"তুমি কি রজতকে আরো পাঁচ বছর অপেক্ষা করে বসে থাকতে বলো," দীপালী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

"না, না, তা' কেন। এক কাজ করো রজত, সোজা রতনলালের সঙ্গে গিয়ে দেখা করো। অদ্ভুত ভালো লোক, খুব সিমপ্যাথেটিক, আর ও তোমার মতো স্মার্ট ছেলে খুব পছন্দ করে। জীবনে নিজের চেষ্টায় এগুতে হয় রজত, কারো ব্যাকিং-এর অপেক্ষায় বসে থাকলে চলে না। এই দেখ না-স্যর রাজেন মুখার্জিকে, রকফেলারকে, কার্নেগিকে। কার্নেগির লাইফ পড়েছো? আমার কাছে আছে, নিয়ে যেও এক সময়—।"

ভেতর থেকে বেয়ারা এসে বললো সায়েবের ফোন এসেছে।

মোহিত উঠে গেল।

"বড়দি, আজ উঠি—।"

"চললি?"

"আরেকদিন আসবো'খন—।"

"রুপুর জন্যে ছেলে দেখছিস আর কোথাও?"

"মা আর বাবা দেখছেন বোধ হয়, আমি ঠিক জানি না।"

একটু চুপ করে থেকে দীপালী বললো, "ওর জন্যে কোনো সাধারণ গেরস্ত ঘরের সাদাসিধে ছেলেই দেখিস, বুঝলি। বড়লোকের ঘরে পেলেও দিবিনে। গরীবের ঘরে সুখেই থাকবে।"

রজত হাসলো। বললে, "গরীবের ঘরে কি সুখ তা'তো দেখছি। তবে বড়লোকই বা পাচ্ছি কোথায়।" একটু চুপ করে থেকে হেসে বললো, "ওকে সেদিন বোঝাবার চেষ্টা করলাম, মা বাপের ভরসা করিসনে। একটি ভালো ছেলে খুঁজে নিয়ে প্রেম টেম কর। ঘোষদের বাড়ির মিনতিকে দেখ, গাঙ্গুলীদের বাড়ির নন্দিতাকে দেখ, কি রকম ভালো ভালো ছেলে জুটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু রুপুটা এসব তালে নেই। অন্য মেয়েদের ভায়েরা ডাণ্ডা নিয়ে বোনেদের পাহারা দেয়, তবু ওরা ঠিক কোথাও না কোথাও গেঁথে যায়, আর রুপুর বেলা আমি চোখ বুজে বসে থাকতে রাজী, তবু সে আমার কথা শুনে শুধু হাসে আর বলে, আমার নাকি মাথা খারাপ।"

দীপালী হাসলো, তারপর বললো, "না না, ওসব ওর মাথায় ঢোকাসনে। ও বেশ ভালোই আছে। মা-বাবা যাকে ঠিক করবেন সেই ভালো। আমাদের বাড়ি অনেকদিন শানাই বাজিয়ে ঘটা করে বিয়ে হয়নি। রুপুর বিয়েতে সবাই মিলে খুব হৈ হৈ করা যাবে।"

দীপালীর বিয়ে হয়েছিলো কোর্টে। রজতের মনে পড়লো সে কথা। কিছু বললো না, চুপ করে রইলো।

দীপালী বলে চললো, "পারলে আমার ননদ ক্ষমুর বিয়েও দিতাম খুব সাধারণ ঘরের ছেলের সঙ্গে। ওরা বৌকে সুখে রাখতে জানে, আর খাটে, জীবনে উন্নতি করবার চেষ্টা করে। বড় ঘরের ছেলেগুলো আজকাল যা হয়েছে, দিনরাত ভুল ইংরেজি বলবে, কাউকে মানুষ বলে জ্ঞান করবে না, খাটবে না, নিজের বাপদাদার পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে একে ওকে ধাপ্পা দিয়ে টাকা করবার চেষ্টা করবে, বাজারে অজস্র ধার করবে, মদ খাবে আর

নানা রকম নোংরামি করে বেড়াবে। দেখে দেখে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।"

রজত চলে যেতে মোহিত ফিরে এলো। ক্ষমাও নেমে এলো উপর থেকে।

"বৌদি, তোমার ভাই চলে গেছে?" ক্ষমা জিজ্ঞেস করলো।

দীপালী কোনো উত্তর দিলো না।

ক্ষমা বলে চললো, "কি রকম যেন রাস্টিক্। তবে সে তো হবেই, কোনোরকম সোসাইটির টাচ্ নেই। কোত্থেকেই বা থাকবে—।"

একটি শক্ত কথা দীপালীর মুখে এসে ঠোঁটের কাছে আটকে গেল। মুখে বৌদি-সুলভ হাসি ফুটিয়ে বললো, "সব সময় রজতের নিন্দে করলে কিন্তু ওর সঙ্গেই ধরে বিয়ে দিয়ে দোবো।"

"ওরে বা-বা, তার চাইতে কোনো এ্যাবরিজিন্যালের সঙ্গে বিয়ে দিও, আমার কোনো আপত্তি নেই। রজতের যে গুণগুলো তোমার পছন্দ, সে সব অনেক বেশী মাত্রায় আছে ওদের মধ্যে।"

মোহিতের একটা গর্ব, সে নাকি সব সময় সোজাসুজি কথা বলে, পষ্ট কথা শুনিয়ে দেয় সবাইকে।

ক্ষমাকে বললো, "তোমার বৌদি যে খুব গরীবের ঘরের মেয়ে, তাই নিয়ে ওকে খোঁটা দেওয়া তোমার উচিত হয়নি, ক্ষমা।"

দীপালীর কান দুটো লাল হয়ে গেল।

সেটা লক্ষ্য করলো মোহিত। সঙ্গে সঙ্গে বললো, "ক্ষমা, তুমি যদি তোমার বৌদির খানিকটা একমপ্লিশ্মেণ্ট্ও পাও, কলকাতার যে কোনো পরিবার তোমার জন্যে গর্ব বোধ করবে।"

দীপালী খুশী হোলো না খুব।

"বৌদি গরীবের ঘরের মেয়ে বলে তো আমি কোনো খোঁটা দিইনি। বৌদির দাদামশায়ের নামে কলকাতায় একটি লেন না বাই-লেন কি একটা

যেন আছে। আমার দাদামশায়ের নামে তো নেই! খোঁটা দেওয়ার স্পর্ধা আমার হবে কেন," বলে ক্ষমা সেখান থেকে উঠে চলে গেল।

ক্ষমা চলে যেতে আবহাওয়াটা একটু সহজ করে নেওয়ার চেষ্টা করলো মোহিত।

বললো, "রজত বোধ হয় আমার উপর রাগ করে চলে গেল। ভাবলো আমি ওর জন্যে কিছু করবো না। ব্রাদার-ইন-ল'টা বুঝলো না যে আমি ওর ভালোর জন্যেই বলেছি। ও সোজা গিয়ে রতনলালের সঙ্গে দেখা করুক, চটপট কথাবার্তা বলে ওকে ইম্প্রেস্ করুক। তারপর আমি গিয়ে যা বলবার বলে টলে ওকে একটা কোথাও বসিয়ে দেবো। তুমি ভেবো না দীপা, ওর একটা ব্যবস্থা হবেই। অসুবিধেটা কোথায় জানো, আজকালকার ইণ্ডিয়ান বিজনেসম্যানগুলো সায়েবদের থেকেও বেশী সায়েব হয়ে গেছে। ওরা চায় পাবলিক-স্কুল-এডুকেশান পাওয়া ছেলে। তাই জিজ্ঞেস করে কোন্ স্কুলে পড়েছো, কোন্ কলেজে, তুমি কোন্ কোন্ ক্লাবের মেম্বার, নাচতে জানো কিনা, তোমার বাবা কে—এই সব। যাই হোক, রজতের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমার শালা রাস্তার লোফার হয়ে ঘুরে বেড়ালে যে আমারই মাথা কাটা যায়। আচ্ছা, আমি এবার বেরোই একটুখানি। ফিরতে একটু রাত হবে।"

খানিকটা এগিয়ে ফিরে এলো, "ও হ্যাঁ, একটা মজার খবর তোমায় দেওয়া হয়নি। রজত বলতে পারলো না রুপালী কোথায় চাকরি করছে। কিন্তু আমি জানি। ইন্ ফ্যাক্ট ওকে আজই দেখলাম।"

"কোথায়," জিজ্ঞেস করলো দীপালী।

"পানামা কোং স্টোরেজের অফিসে। আমি তো ওখানকারও একজন ডিরেক্টার। আমাদের বাড়িতেই অফিস। ওপর থেকে নীচে নেমে ওই ডিপার্টমেন্টে ঢুকেছিলাম। দেখি সে একটি টেবিলে বসে খুব কাজ করছে। দেখে হাসি পেলো। আমাদের সেই রুপু, যে একটি ছিটের ফ্রক পরে রাস্তায়

এক্কা-দোক্কা খেলতো, সে এখন বড়ো হয়ে লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি করছে।"

"ও তোমায় দেখেনি ?"

"হ্যাঁ, দেখেছে।"

"ওর সঙ্গে কথা বলোনি ?"

"ম্‌·········বলতাম······কিন্তু তখন আমি এত ব্যস্ত যে আমার কোনো দিকে তাকানোর ফুরসত নেই। তখন তুমি সামনে থাকলেও হয়তো কথা বলবার সময় পেতাম না। পরে ভাবলাম, অফিসে কথা বলিনি সে ভালোই হয়েছে। ওকে সবাই হয়তো নানা রকম প্রশ্ন করবে, আমার শালী বলে জানলে অন্যান্য ডিরেক্টারেরাও ওর সঙ্গে শালীসুলভ রসিকতা করতে পারে। তার চেয়ে বরং একদিন তোমার বাপের বাড়ি গিয়ে ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সোজা এখানে চলে আসবো। তারপর সবাই মিলে খুব গল্প করা যাবে। আরে ? সাড়ে সাতটা বেজে গেল এরই মধ্যে ? বড্ড দেরি হয়ে গেল।"

দীপালীকে আর কিছু না বলেই সবেগে প্রস্থান করলো মোহিত চ্যাটার্জি।

গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার আওয়াজ এলো। হেড-লাইটের আলো পড়লো গেটের ওপারে। গাড়ি বেরিয়ে গেল। পেছনদিকের লাল আলো অদৃশ্য হোলো রাস্তার বাঁকে।

দীপালী একা বসে রইলো বারান্দায়।

চোখ চিক চিক করে উঠলো বারান্দার আলোতে।

তারপর দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো পাউডার-শুভ্র গাল বেয়ে।

মোহিতের একটি কথা মনের কোণে রিম-ঝিম করে উঠলো বার বার ঃ

আমাদের সেই রুপু যে একটি ছিটের ফ্রক পরে রাস্তায় এক্কা-দোক্কা খেলতো·········

*   *   *   *   *   *

দীপালীর ওখান থেকে রজত সোজা এলো প্রবাল মুখার্জির বাড়ি।

কোনো রকম ভণিতা না করেই তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলো সোজাসুজি। বললো, "মিস গুহকে একটু বলে দেখুন না যদি চাকরিটা হয়ে যায়। আমার জন্যে বলবার তো কেউ নেই। তাই আপনার কাছেই এলাম।

প্রবাল একটু ভাবলো। "আচ্ছা, আমি বলে দেখবো। সুমিতা তো পাবলিক রিলেশান্স ম্যানেজার। এসব ব্যাপারে ওর হাত আছে কিনা জানি না। দেখা যাক কি করা যায়।"

একটু পরে জিজ্ঞেস করলো, "এর আগে কোথাও কাজ করোনি, না?"

"না।"

"তবে তো একটু অসুবিধে হবে। তবু দেখা যাক—।"

রজত একবার ভাবলো একটা কথা প্রবালকে বলা যায় কিনা। আজ পর্যন্ত আর কাউকে বলেনি। একজন কাউকে বলবার জন্যে ওর মন হাঁসফাঁস করছিলো। নাঃ, বলেই ফেলি, ভাবলো সে।

"এ চাকরি আমার না পেলে নয় প্রবাল দা'—।"

"কেন?"

"আপনি কাউকে বলবেন না তো? অন্তত ছোড়দি বা রূপালীকে নয়।"

"না, বলবো না, বলো।"

"আমি প্রেমে পড়েছি," রজত রাঙা হয়ে বললো।

"তাই নাকি," খুব উল্লসিত হোলো প্রবাল, "একটা কাজের মতো কাজ করেছো।"

"এখন তো ওকে বিয়ে করতে হবে—।"

"নিশ্চয়ই।"

"মেয়েটি কিন্তু পাঞ্জাবী। রেফ্যুজি—।"

"খুব ভালো কথা। নিশ্চয়ই খুব ভালো মেয়ে, তোমায় ভালোবাসে যখন—।"

"খুব ভালো মেয়ে প্রবাল দা' চলুন একদিন আলাপ করিয়ে দেবো। খুব সুন্দর দেখতে।"

"খুব খুশী হলাম শুনে—,"প্রবাল একটু হেসে বললো।

"জানেন, ও চাকরি করে," চক্ষু বিস্ফারিত করে রজত বললে।

প্রবালের মনে একটু করুণা হোলো। বেচারা! ওরা এত কাছাকাছি, তবু এই ব্যবধান। ও চাকরি করে, এ করে না—।

"রুপালীদের অফিসেই রিসেপ্‌শানিস্ট।"

"তাই নাকি? তা'হলে তো ওকে দেখেছি মনে হচ্ছে—।"

"জানেন প্রবাল দা', একটা সময় ছিলো, যখন ট্রামে বাসে অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু আমার নাগালের মধ্যে কাউকে দেখিনি। পথ দিয়ে ছেলে মেয়ে গল্প করতে করতে চলে গেছে, আর আমার মনে হয়েছে আমি যেন একটি আলাদা পৃথিবীর লোক। আমার কোনো দাম নেই কোনো মেয়ের কাছে, আমি একটি বেকার, নিষ্কর্মা, অপদার্থ। মেয়ে জাতটার উপরই রাগ হোতো। ভাবতাম কোনোদিন কোনো মেয়ের প্রেমে পড়বো না। যদি জীবনে উন্নতি করতে পারি, মেয়ের বাপের গলা টিপে টাকা নিয়ে বিয়ে করবো। আমার যদ্দিন কিছু ছিলো না, তদ্দিন আমার দিকে ফিরে তাকাসনি, আজ হঠাৎ কেষ্ট বিষ্টু হয়েছি বলে মিন্ মিন্ করে প্রেম করতে এসেছিস—একথা ভেবে রেখেছিলাম ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে কাউকে বলবো বলে। আর এসব ভাবতে ভাবতে নিজের কাছেই নিজে ছোটো হ'তে আরম্ভ করেছিলাম দিনের পর দিন, নিজের উপর সমস্ত বিশ্বাস চলে যেতে আরম্ভ করেছিলো।

এমন সময় এলো ডলি দেশরাজ। কি জানি কি দেখলো আমার মধ্যে। আর কিই বা আছে যে দেখবে—। কি রকম যেন মায়ার কাঠি ছুঁইয়ে আমার

সব কিছু বদলে দিলো। আমার নিজের উপর বিশ্বাস ফিরে এলো, যখন দেখলাম সেও বিশ্বাস রাখে আমার উপর। ওকে ভালোবাসি বলে মেয়ে জাতটার উপরই আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা সব কিছু ফিরে এলো।—আপনি কোনোদিন প্রেমে পড়েছেন প্রবাল দা' ?"

প্রবাল একটু হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না।

রজত বলে চললো, "আজকাল মনে শুধু একটা ভাবনা, কি করে জীবনে উন্নতি করা যায়। আমার জন্যে নয়, ডলির জন্যে। ও আমার এতখানি করলো, আমি ওর জন্যে যদি এটুকু করতে না পারি, তা' হলে আমার পুরুষ হয়ে জন্মানো বৃথা। এ ভাবনায় আজকাল আমার চোখে আর ঘুম নেই প্রবাল দা'। যে সব বেকার ছেলের ঘরে বিয়ে করা বৌ আছে তাদেরও বোধ হয় এতটা দুর্ভাবনা নেই।"

রজতের উচ্ছ্বাস দেখে প্রবাল আবার একটু হাসলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "তোমার দুর্ভাবনা আছে মানি, কিন্তু ওদের সঙ্গে তুলনা না টানাই ভালো। যে সব বেকার ছেলের ঘরে বিয়ে করা বৌ আছে তাদের ছেলে মেয়ে আছে, কিন্তু রান্নার চাল নেই, ছেলের দুধ নেই, তাদের কতোখানি দুর্ভাবনা তুমি ভাবতে পারবে না রজত। আর তাদের কতোখানি মনের জোর যে গলায় দড়ি দিয়ে সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করছে না, তাও তুমি ভাবতে পারবে না।"

রজত একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "জানেন, পানামা যে গ্রুপের কনসার্ন, আমার ভগ্নীপতি তাঁর একজন ডিরেক্টার।"

"তাই নাকি ? মোহিত চ্যাটার্জি ?"

"হ্যাঁ। ওঁর স্ত্রী আমার দিদি।"

"আপন ?"

"হ্যাঁ।"

"উনি থাকতে—"

"উনি থাকতেও যখন ওঁকে বলছি না তখন বুঝতেই পারছেন।"

"ও," চুপ করে গেল প্রবাল।

"কাউকে বলবেন না।"

"আচ্ছা, বলবো না।"

রজত একটু চুপ করে রইলো।

তারপর বললো,

"হাইকোর্টের জজ্ নীহারপ্রসূন রায়চৌধুরী আমার আপন পিসীর ভাশুর—।"

"ও।" প্রবাল উৎসাহ বোধ করলো না।

"বলিভিয়ায় ইণ্ডিয়ান এম্‌ব্যাসির ফার্স্ট সেক্রেটারি অনঙ্গ চৌধুরী আমার মাসতুতো ভাই। আমার মায়ের আপন খুড়তুতো বোনের ছেলে।"

"আচ্ছা!" অতিকষ্টে নিরুৎসাহ ভাব গোপন করলো প্রবাল।

"বিখ্যাত ফিজিশিয়ান ডাক্তার ব্যোপদেব সরকার বাবার আপন মামাতো ভাই।"

"তাই নাকি।"

রজত কি যেন ভাবলো একটুখানি। প্রবাল দেখলো তালিকা বোধ হয় আরো দীর্ঘতর হবে।

আস্তে আস্তে বললো, "রজত!"

"বলুন।"

"মধ্যবিত্ত পরিবারের যে কোনো ছেলেরই তিন রকম আত্মীয় থাকে। এক রকম—যারা খুব বড়ো হয়ে গেছে, জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, সবাই তাদের নাম জানে। আরেক রকম—যারা আমাদেরই মতো সাধারণ, সাদাসিধে। তৃতীয় দলে থাকে—এমন সব আত্মীয় স্বজন, যাদের পরিচয় দেওয়া যায় না, যাদের নাম মুখে আনা যায় না, যারা জোচ্চোর, লম্পট, বদমাইস, সব কিছু। যে কোনো ভদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের যে কোনো ছেলেকে ধরে খোঁজ

নাও, দেখবে তার এই তিন রকম আত্মীয়ই আছে। এদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ থাকে না, সম্পর্ক থাকে না, যাওয়া আসাও হয়তো থাকে না— থাকে শুধু তাদেরই সঙ্গে, যারা তুমি নিজে যে ধরনের লোক, ঠিক সে ধরনেরই।" প্রবাল একটু থামলো, তারপর আস্তে আস্তে বললো, "যারা তোমার দলের নয়, তাদের নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো।"

রজত শুনে একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "দিদিও আমায় একদিন একথা বলেছিলো। কিন্তু কি করবো, মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে!"

প্রবাল একটু না হেসে পারলো না। সে হাসিতে যোগ দিলো রজতও।

চা খেয়ে রজত উঠে পড়লো।

"তুমি ভেবো না রজত," প্রবাল বললো, "আমি সুমিতাকে কালই বলবো। ডলি মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলেছো যখন, একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে চলবে কেন।"

রজত হাসলো একটু। তারপর এগিয়ে গেল দরজার কাছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, "একটা কথা জানেন প্রবাল দা', রুপালী বোধ হয় আপনাকে বলেনি। শেয়ালদা অঞ্চলে আমার দাদুর নামে একটি রাস্তা আছে—শ্যামাকান্ত সেন লেন।"

রজত চলে গেল।

প্রবাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর একটু ম্লান হেসে একটি সিগারেট ধরালো।

দিন ছয় সাত পর ডলি দেশরাজ একদিন জিজ্ঞেস করলো, "কিছু করতে পারলে?"

"হ্যাঁ, তোমাদের অফিসের পারসোন্নেল অফিসারের কাছে ইন্টারভিউ দিয়েছি। শুনছি দিন কয়েক পর তোমাদের ডিরেক্টারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। খুব সম্ভব হয়ে যাবে চাকরিটা," রজত বললো।

"তোমায় একটি ভালো স্থট করিয়ে দেবো ?"

"তুমি ? না ভাই, আমার যা আছে এতেই হবে।"

"শোনো, মনে কোরো না যে সব টাকা একসঙ্গে দিতে হবে। লিণ্ডসে স্ট্রীটে আমাদের চেনা একজন পাঞ্জাবী রেফ্যুজি একটি দরজির দোকান দিয়েছে। খুব ভালো কাটার। ভালো ভালো কাপড় আছে ওর কাছে। একসঙ্গে করিয়ে নাও, ওকে মাসে মাসে পোনেরো কুড়ি টাকা করে দিলেই হবে—।"

"ও বুঝি এ ভাবে ব্যবসা করছে ? দু'দিনে লালবাতি জ্বালাবে—।"

"এ ব্যবস্থা সবার জন্যে নয়," ডলি হেসে বললো, "শুধু চেনাশোনাদের জন্যে। আমাদের জাতের ছেলেরা যে এত ভালো ভালো স্থট পরে বেড়ায়, তুমি কি ভেবেছো সবার পয়সা আছে, সবাই নগদ টাকা দিয়ে স্থট করায় ? অনেকেরই অবস্থা তোমার মতো।"

"আচ্ছা, একটি স্থট আপাতত করা যেতে পারে—।"

"এটি কিন্তু আমি তোমায় প্রেজেণ্ট দিচ্ছি।"

"উঁহু, সেটি হবে না," রজত মাথা নাড়লো।

"তা' হলে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলবো না বলে দিচ্ছি।"

কয়েকদিন পর প্রবাল ডেকে পাঠালো রজতকে।

রজত খুব খুশী মনে গিয়ে উপস্থিত হোলো।

তারপর শুনে মুখের খুশীর আলো ম্লান হয়ে এলো।

চাকরিটা প্রায় হয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু ডিরেক্টার হঠাৎ ঠিক করেছেন এখন লোক নেওয়া হবে না। মাস ছয়েক পর আবার বিবেচনা করে দেখা যাবে।

তা'ছাড়া অফিসে নাকি গোলমাল চলছে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ান আর কর্তৃপক্ষের মধ্যে। এ গোলমাল না মেটা পর্যন্ত অন্য কোনো ব্যাপারে মন লাগাতে চাইছেন না ডিরেক্টারেরা।

কোনো কথা বললো না রজত। চুপ করে বসে রইলো।

"তাই বলে মন খারাপ কোরো না," প্রবাল বললো, "তুমি খোঁজে থাকো, আমিও খোঁজে থাকি। আমিও তো আর পাঁচ দশটা অফিস ঘুরে বেড়াই, বন্ধু বান্ধব আছে নানা অফিসে, খোঁজ একটা না একটা পেয়ে যাবোই।"

"আমি মন খারাপ করিনি প্রবাল দা'," রজত আস্তে আস্তে বললো। "শুধু ভাবছি কদ্দিন আমি ভালো থাকতে পারবো। মাঝে মাঝে ভাবি দূর ছাই, এরকম ভাবে চাকরি খুঁজে খুঁজে কি হবে। কতো লোক কতো ভাবে পয়সা কামাচ্ছে, হয়তো সে সব পথ ভদ্র নয়, পরিষ্কার নয়, কিন্তু কি আসে যায় তাতে।"

"পাগলামি কোরো না রজত। এদ্দিন কাটিয়ে দিলে, আর দু'দিন ধৈর্য ধরে থাকো না—!"

"জানেন প্রবাল দা', বাড়ির লোকের সঙ্গে একটু একটু ক্রিমিন্যাল হতে আরম্ভ করেছি। চ্যারিটি বিগিন্‌স্ এ্যাট হোম। সেদিন ছোড়দিকে ব্ল্যাকমেল করলাম—।"

"শ্যামলীকে ?"

"হ্যাঁ। ছোড়দিকে বললাম, টাকা দাও। ছোড়দি বললে, নেই। তখন বললাম, যদি না দাও তো প্রবাল দা'র কাছে ধার চাইবো। ছোড়দি বললে, ওঁর সঙ্গে ভালো সম্পর্কটা আছে, তোর জন্যে কি সেটা নষ্ট করতে হবে ? আমি বল্লাম, তোমার কিসের অতো মাথাব্যথা ? ছোড়দি কোনো কথা না বলে পাঁচটা টাকা দিয়ে দিলে।—রঞ্জিত দা', সব নোংরামি বোধ হয় এভাবেই আস্তে আস্তে আরম্ভ হয়।"

শুনে প্রবাল চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। সে অন্য কি যেন ভাবছিলো।

প্রবালের ওখান থেকে রজত ফিরে গেল ডলি দেশরাজের বাড়ি।

রজতের ম্লান মুখ দেখে ডলি উঠে গিয়ে এক কাপ কফি তৈরি করে নিয়ে এলো।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "কি ব্যাপার রজত? তোমার মুখ অতো অন্ধকার কেন? তোমার কি ধারণা ওরকম চেহারা আমার খুব পছন্দ?"

রজত তার চাকরি না হওয়ার ব্যাপারটা খুলে বললো ডলিকে।

ডলি শুনে একটু হেসে বললো, "এতেই হতাশ হয়ে পড়ছো কেন? তুমি চেষ্টা করে না হয় পেলে না, এবার আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।"

"তুমি কী চেষ্টা করবে?"

"আমি নিজে ডিরেক্টারকে বলবো।"

"তুমি বলবে?" অবাক হোলো প্রবাল।

"হ্যাঁ, আমার সঙ্গে চেনা আছে। শেঠ কিশোরীলালের পি-এ ছুটিতে গেছে। তার জায়গায় এখন আমি কাজ করছি।"

"কিন্তু শুনেছি ও লোক সুবিধের নয়—।"

"আমার নিজের জন্যে হলে বলতাম না। তোমার জন্যে বলবো।"

সেদিন সন্ধ্যেবেলা প্রবাল আর সুমিতা দাঁড়িয়ে ছিলো গড়িয়াহাটের মোড়ে।

সঙ্গে দু'জন বন্ধু ছিলো। ওরা একটা দোকানে সওদা করতে ঢুকেছে। দোকানে খুব ভিড় বলে এরা দাঁড়িয়েছিলো বাইরের ফুটপাথে। বন্ধুরা বেরিয়ে এলে তারপর সিনেমা দেখবার প্রোগ্রাম।

রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিলো একটার পর একটা ট্রাম, বাস আর গাড়ি। এপাশে ওপাশে বেলফুলের মালা বিক্রি করছিলো মালাকরেরা।

সুমিতা এক গোছা রজনীগন্ধা কিনলো। নানা রঙের বেলুন উড়িয়ে একজন বেলুনওয়ালা চলে গেল পাশ কাটিয়ে।

স্থমিতা কথা বলে যাচ্ছিলো পাহাড়ী ঝরণার মতো। হাত মুখ নেড়ে কি যেন বোঝাচ্ছিলো প্রবালকে।

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে হঠাৎ সে লক্ষ্য করলো প্রবাল আনমনে কি যেন ভাবছে।

"কি ভাবছো প্রবাল ?" স্থমিতা জিজ্ঞেস করলো।

"কিছুই ভাবছি না। দেখছি," প্রবাল আস্তে আস্তে বললো।

"কি দেখছো ?"

প্রবাল নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে রাস্তার ওপারের ফুটপাথের দিকে।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে স্থমিতাও তাকালো সেদিকে।

দেখলো, জনতার স্রোত উজান বেয়ে চলেছে ফুটপাথ ধরে। তার বেশী দ্রষ্টব্য কিছু আছে বলে মনে হোলো না স্থমিতার।

"কি অতো দেখছো বলো না," জিজ্ঞেস করলো প্রবালকে।

"ওই দেখ," প্রবাল হাত বাড়িয়ে দেখালো।

"কি ?"

"দেখতে পাচ্ছো না, রাস্তার ও ফুটপাতে কতো ছেলে হেঁটে চলে যাচ্ছে একজনের পর একজন। কারো সঙ্গে একটি মেয়ে নেই। রাস্তার এ ফুটপাথে কতো মেয়ে হেঁটে যাছে জমকালো শাড়ি ব্লাউস পরে। কারো সঙ্গে একটি ছেলে নেই। নেহাত যদিবা ওপারের কোনো ছেলে এপারের কোনো মেয়েকে পেয়ে যায় তার জীবনে, তখন দেখবে হয়তো আজকের এই এত বড়ো পৃথিবীতে তাদের একসঙ্গে দাঁড়াবার জায়গা নেই।"

ওঃ, এই ব্যাপার !

হাসি পেলো স্থমিতার।

সে ফিরে তাকালো প্রবালের দিকে।

কি রকম যেন আনমনা দেখাচ্ছে প্রবালকে। সত্যি, কি হয়েছে ওর !

"হঠাৎ তোমার এরকম মুড্ কেন এলো প্রবাল ? আমি তো তোমার

সঙ্গেই আছি, আর দাঁড়িয়ে গল্প করবার জায়গাও আমরা পেয়ে গেছি,” সুমিতা হাসতে হাসতে বললো।

প্রবালও হাসলো।

হেসে বললো, “আমি ভাবছিলাম রজতের কথা, আর একটি মেয়ের কথা, যাকে সে ভালবাসে।”

“রজতের কথা অতো ভাবছো কেন?”

“শুধু ওর একলার কথা নয় বলেই ভাবছি সুমিতা। আজ বিকেলে ওর যে মুখে বিষণ্ণ ছায়া নামতে দেখলাম, এখন রাস্তার এপারে ওপারে অনেকের মুখেই দেখছি সেই একই বিষণ্ণ ছায়া। আজ আমার মনটা তাই খুব খারাপ হয়ে আছে।”

সুমিতা একটু চুপ করে থেকে তারপর হেসে ফেললো।

আস্তে আস্তে বললো, “আমার ট্র্যাজেডি একবার ভেবে দেখ প্রবাল। এমন চমৎকার সন্ধ্যা, চারদিকে এত ভিড়, এত আলো, এত রঙ, তোমার পাশে আমি দাঁড়িয়ে, আকাশে চাঁদ, আমার হাতে রজনীগন্ধা—আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যের মুখে বিষণ্ণ ছায়া দেখছো।”

॥ ছয় ॥

শ্যামলী বাড়ি আসতো শনিবার সন্ধ্যায়।

সেদিন এক শনিবার বিকেলে বেরুনোর আগে কর্তা মশায়ের লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো।

কর্তামশায়ের সঙ্গে গল্প করছে প্রবাল মুখার্জি।

"একি, আপনি? এখানেই আছেন তাতো বলেননি," বললে প্রবাল।

"ওকে চেনো নাকি?" কর্তামশায় জিজ্ঞেস করলেন।

শ্যামলী চট্ করে কি বলবে ভেবে পেলো না।

প্রবাল বললে, "হ্যাঁ, ওদের পরিবারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে।"

"আপনি এখানে?" শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো।

"পাশের বাড়িটি আমার একজন খুব নিকট আত্মীয়ের। মাঝে মাঝে আসি ওখানে। এলে এখানেও একবার দেখা করে যাই।"

সেদিন ফেরার পথে একসঙ্গে বেরুলো শ্যামলী আর প্রবাল।

বালিখালটা পেরিয়ে প্রবাল বললো, "আপনার কি বাড়ি ফেরার তাড়া আছে?"

"কেন?"

"যদি তাড়া না থাকে, চলুন দক্ষিণেশ্বরটা হয়ে যাই। এদিকে এলে আমি ওখানেও ঘুরে যাই একবার। বেশ নিরিবিলি গঙ্গার পাড়টি। ভালো লাগে চুপচাপ বসে থাকতে।"

গঙ্গার পাড়ে সেদিন অনেকক্ষণ পাশাশাশি বসে গল্প করলো দুজনে। গোধূলির মেঘগুলো তখন রঙিন হয়ে উঠেছিলো। গঙ্গার ঝিরঝিরে জোলো হাওয়ায় শ্যামলীর চুলের মিষ্টি গন্ধ বিপর্যস্ত করে তুললো প্রবালকে।

জোয়ার আসছিলো গঙ্গায়। একটি স্টীমলঞ্চ ভেসে যাচ্ছিলো ঢেউ তুলে আর হুইস্‌ল্ বাজিয়ে।

সেই সন্ধ্যার পরিবেশটুকু শ্যামলী কিছুতেই ভুলতে পারলো না তার পরের সাতটি দিন।

পরের শনিবার গঙ্গার ওপারের দিকে তাকিয়ে একটি আনমনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বালিখালের সাঁকোটা পেরিয়ে দেখে পানের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে প্রবাল মুখার্জি।

বললে, "আবার এলাম। আসবো আপনার সঙ্গে?"

একি অন্যায় কথা, ভাবলো শ্যামলী। একদিন ওর সঙ্গে বেড়াতে গেছি বলে কি প্রত্যেকদিন যেতে হবে। কিন্তু মুখ ফুটে আপত্তি জানালো না।

গেল।

সেদিন প্রবাল একথা সেকথার পর বললে, "আমায় ভুল বুঝবেন না। কেন এলাম জানেন? শহরের বাঁধাধরা জীবনের ছোটো গণ্ডির মধ্যে হাঁফিয়ে উঠেছি। ওখানে চেনাশোনার মহলটা বড়ো কৃত্রিম, বড়ো এক-ঘেয়ে। সেদিনের সন্ধ্যাটি এখানে কাটিয়ে হঠাৎ বড়ো ভালো লেগেছিলো। খুব সহজ হওয়া গিয়েছিলো আপনার কাছে। মনে হয়েছিলো যেন জেলখানা থেকে দু'ঘণ্টার ছুটি পেয়েছি।"

শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো, "আপনারও ওরকম মনে হয়? আমার তো ধারণা আপনার জীবনে কোনো দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা নেই, বেশ আছেন।"

"কতোটুকু আর জানেন আমার সম্বন্ধে।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো প্রবাল, তারপর বললে, "বাড়ির লোকে বলে অভিভাবক ছাড়া আমি নাকি থাকতে পারি না। বাবা আর মা নিজেদের অবর্তমানে কি হবে সেই দুর্ভাবনায় ভবিষ্যতের একজন অভিভাবকের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমি জানলাম

আমি তার। সেও জানলো আমি তারই। বন্দোবস্তটা আগে থেকে জেনে নিলাম বলেই বোধ হয় কেউ কারো কাছে সহজ হতে পারলাম না। এমনি আমরা খুব বন্ধু, একসঙ্গে ঘোরাফেরা করি, গল্প করি—কিন্তু কি জানি কেন তার বেশী অন্তরঙ্গ হওয়া গেল না, কোনো রোমাঞ্চ অনুভব করা গেল না তার সান্নিধ্যে। সে যে জীবনে অনেক বেশী কৃতি হয়েছে এরই মধ্যে, আর আমি এখনো হইনি, এরই সুযোগ নিয়ে জীবনের অচ্ছেদ্য বাঁধনে আবদ্ধ হবার দুর্ঘটনা ঠেকিয়ে রাখলাম, আর সময় নষ্ট করতে লাগলাম আজ একাজ ধরে, সেটা ছেড়ে কাল অন্য কাজ ধরে। আর মনের চোখ খুলে রাখলাম যদি পেয়ে যাই যা খুঁজছি। এক এক সময় মনে হয় যা চাইছি তা হয়তো পাবো না, অনিশ্চিত সুখের স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত সোয়াস্তির জেলখানায় কাটিয়ে দিতে হবে সারাজীবন।"

শ্যামলী রুপালীর কাছে শুনেছিলো সুমিতা আর প্রবালের গল্প। কিছু বললো না। সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে গঙ্গার পাড়ে বসে থাকলে যদি উচ্ছ্বাসের বন্যা আসে কারো কারো মনে, নিরুপদ্রব হলে মার্জনা করা যায় তাকে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রবাল আবার খুব সহজ ভাবে অন্য কথা পাড়লো।

কিন্তু আর কিছুই গেল না শ্যামলীর কানে।

বাড়ি ফেরার সময় যখন হোলো শ্যামলী বললে, "আপনি আজ নিজের অজান্তে অনেক কথাই যেন বলে ফেললেন আমায়। কিন্তু না বললেই ভালো করতেন।"

হঠাৎ একটু বিব্রত বোধ করলো প্রবাল মুখার্জি।

শ্যামলী বললো, "ভুল বুঝবেন না। আমি কিছু মনে করিনি তার জন্যে। তবে আপনাকে আবার এর জন্যে যেন পরে অনুশোচনা না করতে হয়।"

"কেন ?"

"এই যে আমায় এত সব বললেন, পরে হয়তো একদিন ভাববেন, তাইতো, কি সব আবোল তাবোল বকেছিলাম সেদিন। খুব তেমন কিছু চেনাশোনা নেই এমন একজন, তার কাছে গিয়ে কি সব যেন বললাম নিজের সম্বন্ধে।"

প্রবাল উঠে দাঁড়ালো। উঠে পড়লো শ্যামলীও। অন্ধকার নেমে এসেছে চারদিকে। মিটমিটিয়ে আলো জ্বলছে নদীর ওপারে।

প্রবাল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, "বেশ, আমায় যাতে সেই আক্ষেপ করতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে রাজী আছেন ?"

"কি ব্যবস্থা ?"

প্রবাল শ্যামলীর একটি হাত তুলে নিলো নিজের হাতের মধ্যে। শ্যামলীর বুকখানি কেঁপে উঠলো।

"আপনাকে বন্ধু বলে নিলাম। রাজী ?"

শ্যামলী গলাটা একটু সাফ করে নিয়ে হাসলো, সহজ গলায় বললে, "হ্যাঁ—।"

বাড়ি ফিরে সেদিন কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে দিলো শ্যামলী, যদিও সে জানতো প্রবালের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হবে না।

এমনি করে কেটে গেল কয়েকটি শনিবার—তিনটি, চারটি, পাঁচটি।

তারপর একদিন সেই গঙ্গার পাড়ে বসেই প্রবাল বললো।

"শ্যামলী !"

"কি ?"

"একটি কথা কয়েকদিন ধরে বলবো ভাবছি। আজ বলবো, না আরো কয়েকদিন ভেবে বলবো ?"

শ্যামলী একটু চুপ করে রইলো। তারপর উত্তর দিলো, "যেতে দাও না আরো কয়েকটা দিন।"

প্রবাল তখন অন্য কথা পাড়লো—ফোটোগ্রাফি সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতার গল্প।

প্রত্যেক শনিবার শ্যামলী কলকাতায় ফিরতো প্রবালের সঙ্গেই।

সেদিন বাড়ি ফিরতেই রুপালী ছুটে এলো তার কাছে। চোখে মুখে তার উত্তেজনা উপচে পড়ছে।

"কি ব্যাপার? এভাবে ছুটে এলি যে!"

"দারুণ ব্যাপার ছোড়দি, আজ একটি আশ্চর্য ব্যাপার জানলাম দাদার সম্বন্ধে।"

"কি হোলো আবার?"

"দাদা প্রেমে পড়েছে।"

"ও," শ্যামলী খুব উৎসাহিত বোধ করলো না। কিন্তু রুপালী লক্ষ্য করলো না তার এই নির্লিপ্ত ভাব।

বললো, "আমাদের অফিসে একটি পাঞ্জাবী মেয়ে কাজ করে, বুঝলে। বেশ দেখতে। ডলি দেশরাজ ওর নাম। আমার সঙ্গে খুব ভাব। ওর কাছে আগেই শুনেছিলাম ও নাকি একটি বাঙালী ছেলেকে বিয়ে করবে। আজ অনেক পীড়াপীড়ি করবার পরে নাম ভাঙলো। নাম শুনে আমি স্তম্ভিত। সে বললে দাদার নাম। ওকে আমি আর কিছু বললাম না। ভাবলাম আগে একবার তোমায় জিজ্ঞেস করি।"

"আমি আগেই জানতাম," শ্যামলী উত্তর দিলো, "ওদের একসঙ্গে দেখেছিলাম একদিন। মেয়েটি তোদের আফিসে কাজ করে বুঝি? মাকে আর বলিসনে, শুনলে খুশী হবেন না। রজতকেও জানতে দিসনে যে আমরা জানি। ও নিজের থেকে যদি কোনোদিন বলে তো

বলবে। সে যার সঙ্গে প্রেমে করবে করুক, আমাদের মনে করবার কি আছে।"

"তা বটে।"

রুপালী চুপচাপ কি যেন ভেবে নিলো একটু। তারপর বললো, "আচ্ছা ছোড়দি, আমি যদি কোনোদিন আমার পছন্দ করা কোনো ছেলেকে বিয়ে করতে চাই?"

"তক্ষুনি বিয়ের বাজার করতে বেরুবো," বলে শ্যামলী হেসে রুপালীর গাল টিপে দিলো। "পছন্দ হয়েছে নাকি কাউকে? কে সে?"

"কেউ না। এমনি বলছিলাম।"

খাওয়া দাওয়ার পর দু'বোনে একসঙ্গে শুতে গেল। শুয়ে পড়ে শ্যামলীকে জড়িয়ে ধরে রুপালী বললে, "ছোড়দি, তখন তোমায় মিছে কথা বলেছি।"

"কি মিছে কথা?"

"আমার পছন্দ করা সেই ছেলেটি, মিছেমিছি বলিনি, সত্যি সত্যি একজন আছে।"

শ্যামলী হেসে বললো, "সে আমি আগেই আঁচ করেছি। ছেলেটি কে?"

"কাউকে বলবে না বলো!"

"না বললে আসল কাজের আয়োজন হবে কি করে?"

"না, না, এখন কাউকে বোলো না। কিছুদিন পরে বোলো।"

"কে সে?"

"বলবো?"

"বল্ না—।"

"যাঃ, আমার লজ্জা করছে।"

শ্যামলী হেসে ফেললো।

"লজ্জা করে না। বল্—।"

"প্রবাল দা'—।"

"প্রবাল? প্রবাল মুখার্জি?"

শ্যামলী প্রায় উঠে বসেছিলো বিছানার উপর। নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিলো।

"ও কি তোকে বলেছে—?" শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো।

"না, না, ও কিছু বলেনি," রুপালী বললো, "ও হয়তো জানেও না। আমি—ওকে—ছোড়দি—," রুপালীর মুখে আর কথা এলো না। দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে সে কেঁদে ভাসিয়ে দিলো।

জানতেও পারলো না যে দিদির চোখও জলে টল টল করছে।

কিন্তু এ কি করে সম্ভব?……শ্যামলী ভেবে পেলো না।

একটু একটু করে জেনে নিলো রুপালীর কাছ থেকে।

শ্যামলী উত্তরপাড়ায় চলে যাওয়ার পর একদিন রুপালীকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলো প্রবাল।

সে এমন কিছু নয়, শ্যামলীকে আগে একদিন সিনেমা দেখিয়েছিলো—তাই সুমিতার বাড়িতে একদিন দেখা হতে রুপালী প্রবালকে বলেছিলো, দিদিকে সিনেমায় নিয়ে গেলেন, আমায় নিয়ে যাবেন না একদিন? সুতরাং প্রবাল তাকেও একদিন নিয়ে বেরিয়েছিলো। তারপর তাকে চা খাইয়েছে, তাকে নিয়ে ঘুরেছে। ইদানিং তাকে যেন একটু বেশী কোমল মনে হোতো রুপালীর উপর। মার্কেট থেকে ব্লাউসের ছিট, এটা ওটা সেটা অনেক কিছু কিনে দিয়েছে।

রুপালীর মাঝে মাঝে মনে হোতো সে নেবে কেন, কিন্তু প্রবালের সহজ আন্তরিকতায় সে কিছু মনে করতে পারেনি।

তারপর একদিন প্রবালের কথা ভাবতে গিয়ে দেখে তার চোখে জল আসছে। ও যে রুপালীর সঙ্গে এলোমেলো সাধারণ কথাবার্তা ছাড়া আর কিছু বলে না তা'তে রাগ হচ্ছে তার উপর। রুপালী কেন যে চুপ করে অন্য-দিকে তাকিয়ে থাকে দেখা হলে, বেশী কথা বলে না, সেটা প্রবাল জানবার

চেষ্টা করে না বলে অভিমান হয়। এমনি করে একদিন বুঝলো যে নিজের মনের চোরাবালিতে সে নিজেই কবে তলিয়ে গেছে।

"প্রবাল দা'কে কিছু বোলো না ছোড়দি," রূপালী বললো, "আমার মতো মেয়েকে সে বিয়ে করবে না। হয়তো সে সেভাবে ভাবেইনি কিছু, এমনি স্নেহ করে আমায়। শুনলে হেসেই উড়িয়ে দেবে। আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না ওর কাছে। তোমার পায়ে পড়ি ছোড়দি, টেলিগ্রাফ অফিসের কেরানী কি রেল অফিসের মাল বাবু, যার সঙ্গে খুশি আমার বিয়ে দাও, কিন্তু প্রবাল দা'কে কিছু বোলো না। আমার মনে হয় ও অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসে।"

শ্যামলী কোনো উত্তর দিলো না।

অনেকক্ষণ পর রূপালী জিজ্ঞেস করলো, "ছোড়দি, ঘুমিয়েছো ?"

"না, কেন ?"

"আচ্ছা, আমার নাম না বলে, এমনি ঘুরিয়ে অন্যভাবে ওকে জিজ্ঞেস করা যায় না, যাতে সে রাজী না হলে মেয়েটি যে আমি সে কথা কেউ বুঝতে না পারে, আর রাজী হলে মেয়েটি যে আমি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না সেটা বুঝতে পারে ?"

চোখের জলের মধ্যেও শ্যামলীর হাসি পেলো। এত ছেলেমানুষ তার এই বোনটি !

সেই ছেলেবেলায় কবে যেন একটি নীল সিল্কের ফ্রকের জন্যে দিদির কাছে এমনি করে কেঁদেছিলো।

রূপালীর গায়ে হাত বুলিয়ে শ্যামলী আস্তে আস্তে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিলো।

আগে বালিখালের কাছে শ্যামলীর অপেক্ষায় প্রবাল দাঁড়িয়ে থাকতো। কিন্তু ইদানিং আর আসতো না সেখানে। একেবারে গঙ্গার ধারেই বসে

থাকতো শ্যামলীর অপেক্ষায়। শ্যামলী বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি রিক্শ চেপে বালি-ব্রিজ পেরিয়ে সোজা দক্ষিণেশ্বরে গিয়েই উপস্থিত হোতো।

সেদিন গঙ্গার ধারে গিয়ে শ্যামলী দেখে প্রবাল তখনো আসেনি।

হাতঘড়িতে দেখলো সে নিজেই আধঘণ্টা আগে এসে গেছে।

চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ।

আকাশে এক ঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছে, তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখলো।

পেছনে জুতোর আওয়াজ শুনলো শুকনো পাতার উপর।

ফিরে তাকিয়ে দেখে প্রবাল নয়, আরেকজন। মনে হোলো যেন চেনা। হ্যাঁ, চেনাই তো। সেই হরিদাস গুপ্ত, যে দেখতে এসেছিলো রূপালীকে। সঙ্গে একটি ছোট্টো মেয়ে, বছর আড়াই কি তিন বয়েস।

শ্যামলীকে দেখে হরিদাস একটু অপ্রস্তুত হোলো। সরে যাচ্ছিলো সেখান থেকে। কিন্তু মেয়েটি তার নাছোড়বান্দা, সেখান থেকে নড়বে না, সেখানে বসবে একটি ইঁটের পাঁজার উপর। হরিদাস কি আর করে, শ্যামলীকে এড়াতে পারলো না, একটু ইতস্তত করলো সে শ্যামলীকে চিনবে কি চিনবে না।

শ্যামলীর একটু মমতা হোলো।

হাত দুটো তুলে নমস্কার করলো হরিদাসকে।

হরিদাস প্রতিনমস্কার করলো। জিজ্ঞেস করলো, "আপনি এখানে?"

"আমি আজকাল উত্তরপাড়ায় থাকি। এদিকে বেড়াতে আসি মাঝে মাঝে।"

"আমিও ক্বচিৎকদাচিৎ আসি মেয়েটিকে নিয়ে," হরিদাস বললে, "বড্ড দুরন্ত মেয়ে। কারো কাছে যাবে না। ছুটির দিনে একে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরুই এদিক ওদিক।"

যে ছেলেটি তার বোনকে বিয়ে করবার জন্যে দেখতে এসেছিলো তার একটি মেয়েও আছে দেখে প্রথমটা অবাক হয়েছিলো শ্যামলী। তারপর মনে

পড়লো যে এর আগের পক্ষের বৌ একটি মেয়ে রেখে বিয়ের দেড় বছরের মধ্যেই মারা যায়।

বেশ মিষ্টি আদুরে মেয়েটি। হরিদাসের বৌ দেখতে সুন্দর ছিলো নিশ্চয়ই।

কিন্তু হরিদাস তার সঙ্গে গল্পে জমে গেলেই মুশকিল।

"একাই আসেন বুঝি ?" জিজ্ঞেস করলো হরিদাস।

"না, আরেক জন বন্ধু আসে। তার সঙ্গে বসে গল্প করি। সে এসে পড়বে এক্ষুনি।"

শ্যামলী ইচ্ছে করেই প্রবালের নাম বললো না।

দু'চার কথার পর হরিদাস মেয়েটিকে নিয়ে অন্য দিকে চলে গেল, একবারে দৃষ্টির বাইরে।

প্রবাল এলো একটু পরেই।

"আজ এত দেরি যে ?" শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো।

"দেরি কোথায় ? এসে দেখি তুমি হরিদাসের সঙ্গে গল্প করছো। তাই একটু আড়ালে ছিলাম।"

"হ্যাঁ, ওর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। বেড়াতে এসেছিলো এদিকে। ওর মেয়েটিকে দেখেছো, বেশ মিষ্টি মেয়েটি। বেচারী ! এত অল্প বয়েসে মা মারা গেছে ওর !" বললে শ্যামলী।

প্রবাল শ্যামলীর পাশে বসে পড়লো। বসে বললো, "শ্যামলী, আজ ঠিক করে এসেছি যে একটি কথা বলবো তোমায় ।"

প্রবাল বললো।

গঙ্গার বুকে যখন পাল তুলে নৌকো ভেসে যায় আর পাখিরা ফিরে আসে নদী পেরিয়ে, দূর থেকে যখন ভেসে আসে রেলগাড়ির ক্ষীণ আওয়াজ আর আরতির ঘণ্টা শোনা যায় চারদিকের মন্দিরে, তখন শ্যামলীর মতো বড়ো মিষ্টি, বড়ো অসহায় একটি অতি সাধারণ মেয়েকে পাশে বসিয়ে যে দুটো কথা বলা যায় তাই বললো প্রবাল।

আর সমস্ত পৃথিবীর সন্ধ্যা এসে নামলো শ্যামলীর মেঘের মতো চোখে।
নদীর ওপারের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলো শ্যামলী।

"কিছু বলছো না কেন?" প্রবাল আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

শ্যামলী মুখ তুলে তাকালো প্রবালের দিকে।

জিজ্ঞেস করলো, "সুমিতার কাছে কি জবাবদিহি করবে?"

"যাতে জবাবদিহি করবার প্রয়োজন না হয় সে জন্যেই তো তোমায় বললাম যা বলবার।"

"বেশ, তোমার হয়ে জবাবদিহি যা করবার সুমিতার কাছে আমিই করবো তুমি যদি আমার একটি কথা রাখো—," শ্যামলী বললো।

"কি কথা, বলো!"

"যদি বিয়ে করো।"

প্রবাল একটু হাসলো। "বিয়ে করবো বলেই তো পূর্বরাগের ভূমিকাটি পাড়লাম।"

"আমাকে নয়— ।"

"তোমাকে নয়? তবে কাকে?"

"রুপালীকে।"

"রুপালীকে!"

প্রবালের মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ কোনো কথা বেরুলো না।

পরে বললে, "তুমি আমায় অবাক করলে শ্যামলী।"

"রুপালী কি খুব অযোগ্য মেয়ে?" শ্যামলীর চোখ ঠেলে জল বেরিয়ে পড়তে চাইলো।

"সে প্রশ্ন তুলবো না, কারণ আমি যোগ্যতা বিচার করে বিয়ে করতে চাইছি না, চাইছি ভালোবেসে বিয়ে করতে।"

"তুমি সুমিতাকে ভালোবাসো না?"

"সুমিতার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক তোমায় সেদিন বলেছি শ্যামলী। ও

আমার বন্ধু, অনেকদিনের বন্ধু। তবে সেই বন্ধুত্বের ভিত ঠিক ভালো-বাসার নয়, যে ভালোবাসা পাগল করে দিতে পারে আমার মতো একটি ছেলেকে। আমাদের বন্ধুতা অন্যরকম, একসঙ্গে স্কুলে কলেজে পড়ে দু'জন মেয়ে যেরকম অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে ওঠে, ঠিক সেরকম। আমাদের অভিভাবকেরা নিজেদের মধ্যে কথা দিয়ে আমাদের আরো অনেক পাকা পোক্ত বাঁধনের মধ্যে জড়াতে চেয়েছেন। সেটা আমিও চাইনি, বোধ হয় সেও চায়নি। সে কথা মুখ ফুটে জানাতে গেলে যদি বন্ধুত্ব ভেঙে যায়, সে ভয়ে জানানোও হয়নি। ও আমার এত বন্ধু যে ওকে হারানো আমার পক্ষে অসম্ভব। তোমায় ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না. শ্যামলী, এ অবস্থা সওয়াও যায় না, এ অবস্থার হাত থেকে পালানোও যায় না। কোনো উপলক্ষ থাকলেই হয়তো বন্ধুত্ব না হারিয়েও এ অবস্থা কাটিয়ে ওঠা আমার পক্ষে সহজ হতে পারে। শুধু যে আমায় ভালোবাসে সেই আমার পক্ষে এটা সহজ করে তুলতে পারে—শুধু তুমিই পারো শ্যামলী।"

শ্যামলী চুপ করে রইলো। ওর মন প্রায় ভেঙে পড়ে পড়ে, তবু সে সামলে নিলো নিজেকে। বললো, "আমার কথার তো উত্তর দিলে না। বললে না তো, তুমি রুপালীকে বিয়ে করবে কিনা।"

"আমায় ঠাট্টা করছো শ্যামলী?"

"না।"

"ঠাট্টা না তো কি? দুষ্টুমি কোরো না লক্ষ্মীটি। বলো আমায় বিয়ে করবে কি না।"

"আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও—।"

"দেখ শ্যামলী, আজ পর্যন্ত এমন কোনো মেয়ের কথা শুনিনি, সে যাকে ভালোবাসে, সে এসে যদি বিয়ের কথা পাড়ে, তা'হলে মেয়েটি জানতে চায় সে তার বোনকে বিয়ে করবে কিনা। দুষ্টুমি কোরো না, বলো।"

"আমি সত্যি সত্যি জানতে চাইছি তুমি রুপালীকে বিয়ে করবে কিনা।"

অবাক হোলো প্রবাল, "এ প্রশ্ন কি করে ওঠে?"

"মনে করো, আমি বিয়ের প্রস্তাব করছি।"

"বেশ, আমিও বলছি, আমি রাজী নই।"

"যদি বলি, আমার অনুরোধ," শ্যামলী খুব ভেজা গলায় বললো।

"তোমার সব অনুরোধ শুনবো, ওই একটি শুনবো না।"

শ্যামলী আস্তে আস্তে বললো, "জানতাম তুমি রাজী হবে না।"

"এরকম একটি অদ্ভুত কথা তুমি পাড়লে কেন?"

গঙ্গার ওপারের দিকে তাকিয়ে শ্যামলী উত্তর দিলো, "আমার বিবেকটি সাফ রাখবার জন্যে।"

প্রবাল আরো একটু অবাক হোলো, তারপর ভাবলো কি হবে এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে। বললে, "আমি তো তোমার প্রশ্নের জবাব দিলাম, কিন্তু কই তুমি তো আমায় বললে না তুমি আমায় বিয়ে করতে রাজী আছো কিনা!"

ঠোঁট কামড়ে শ্যামলী উত্তর দিলো, "না।"

প্রবালের মন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো। জিজ্ঞেস করলো, "কেন?"

"রূপালীকে না দিয়ে আমি নিজে কিছু নিই না," বলে শ্যামলী মুখ ফিরিয়ে নিলো।

প্রবাল এবার জোরে হেসে উঠলো।

"শ্যামলী, তুমি কী দুষ্টু!" বললো সে।

তারপর হাত দিয়ে চিবুকটি ধরে শ্যামলীর মুখটি ঘুরিয়ে নিলো নিজের দিকে। শ্যামলীর চোখের উপর চোখ পড়তেই তার হাসি বন্ধ হয়ে গেল। শ্যামলীর চোখের কোণ ছাপিয়ে ওঠা জলে চাঁদের একটি ছোট্টো প্রতিবিম্ব দুলছে।

"শ্যামলী!"

শ্যামলী বললো, "তুমিই এ সর্বনাশটি করলে প্রবাল। কে তোমায় বলেছিলো রূপালীকে নিয়ে অতো ঘুরে বেড়াতে, ওকে অতো কিছু কিনে

দিতে? অত্যন্ত ছেলেমানুষ ও। নিজের মনকে রুখতে পারে নি, নিজের অজান্তে তোমায় ভালোবেসে ফেলেছে।"

"আমায়!"

প্রবালের মনের আকাশে বিস্ময়ের বাজ পড়লো।

"সেদিন যখন সে আমায় বলে ফেললো তখনই বুঝলাম যে আমার সুখের আশায় ছাই পড়লো। ও যখন তোমায় ভালোবাসে আর তোমায় যখন পাবে না কিছুতেই, তখন ওর দিদি হয়ে আমি কেমন করে তোমায় বিয়ে করি, তোমার আমার মনের মিল হলেও? আমার যা কিছু ও যখনই চেয়েছে ওকে ভাগ না দিয়ে নিজে নিইনি। তাই আজ তোমার ভালোবাসা আমি ফিরিয়ে দিলাম প্রবাল।"

"একি পাগলামি করছো শ্যামলী! আমি আজই গিয়ে রুপালীকে বুঝিয়ে বলছি—।"

প্রবালকে থামিয়ে শ্যামলী বললো, "তুমি রুপালীকে চেনো না প্রবাল, আর আরো কম চেনো আমাকে।"

দূরের মন্দিরে আরতি থেমে গেছে অনেকক্ষণ।

চোখের জলে ভেসে গেল শ্যামলীর মুখ।

প্রবাল স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলো।

শ্যামলী কলকাতায় ফিরলো প্রবালের সঙ্গেই, কিন্তু সারাটা পথ কেউ কোনো কথা বললো না।

শ্যামলীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে প্রবাল ফিরে চললো। পথ চললে আনমনে। যখন খেয়াল হোলো, দেখে সুমিতার ফ্ল্যাটের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ফিরে যাচ্ছিলো, কারণ সে এসময় এখানে আসতে চায়নি।

কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলো সুমিতা দাঁড়িয়ে আছে।

স্থমিতা বললে, "দরজাটা খোলাই আছে। আমি জানতাম তুমি আসবে। এগোও।"

দরজা ঠেলে প্রবাল ঘরের ভিতর ঢুকলো, পেছন পেছন এলো স্থমিতা।

ঘরে ঢুকেই প্রবাল ক্লান্ত দেহটি এলিয়ে দিলো একটি সোফায়।

স্থমিতা তার সামনে এসে দাঁড়ালো। বসলো না। প্রবালের হাতের সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে স্থমিতার মুখখানি গ্রীক রূপকথার মেডুসার মতো মনে হোলো, আর সে'মুখের দিকে তাকিয়ে পাথর হয়ে গেল প্রবাল মুখার্জি।

"প্রত্যেক শনিবার বিকেলে কোথায় যাও?" স্থমিতা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

"জানোই যদি তা'হলে জিজ্ঞেস করছো কেন?" আরো আস্তে আস্তে উত্তর দিলো প্রবাল।

"তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই। তুমি তো আমার কাছে কোনোদিন কিছু লুকোও না।"

প্রবাল আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে নিলো কোনো উত্তর না দিয়ে।

"কোথায় ছিলে এতক্ষণ," স্থমিতা জিজ্ঞেস করলো।

এক মিনিটের নিঝুম স্তব্ধতা নামলো চারদিকে। দেওয়ালে একটি টিকটিকি ডেকে উঠলো। প্রবাল ছাই ঝাড়লো এ্যাশ-ট্রেতে।

তারপর উত্তর দিলো:

"দক্ষিণেশ্বরে, গঙ্গার ধারে।"

"কে ছিলো সঙ্গে?"

"শ্যামলী।"

"হুঁ"। স্থমিতা হাসলো। "আজ মুখ ভার দেখছি। কি বললে সে।"

প্রবাল চুপ করে রইলো।

"প্রবাল, তুমি তো আমার কাছে কোনোদিন কোনো কথা গোপন করোনি।"

"শুনবে ?"

"হ্যাঁ—"

"বিয়ের কথা পেড়েছিলো," প্রবাল সহজ হবার চেষ্টা করে উত্তর দিলো।

"কে ?"

"শ্যামলী।"

"ওর নিজের ?"

"না। রূপালীর।"

সুমিতা ঘরের ভিতর পায়চারি করলো বার দুই। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি বললে ?"

"আমিও বিয়ের কথা পাড়লাম। আমার সঙ্গে শ্যামলীর।"

"চমৎকার। তারপর কারো প্রস্তাবে কেউ রাজী হলে না, এই তো ? প্রবাল, তুমি এতো ছেলেমানুষ এখনো। এরকম একটা কিছু ব্যাপার আমি আঁচ করেছিলাম। গত শনিবার হাওড়া ষ্টেশনে যেতে হয়েছিলো একবার। আসবার সময় দেখি তুমি বালিখালের বাসে চাপছো। আজ অফিস ফেরত রূপালীকে সঙ্গে করে কলেজ স্ট্রীটে বাজার করতে বেরিয়েছিলাম। ফেরার পথে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে গাড়ির ভেতর থেকে দেখি তুমি আর শ্যামলী ট্রামে চেপে যাচ্ছো পাশাপাশি বসে। আগে প্রত্যেক শনিবার তুমি আর আমি সিনেমায় যেতাম। মনে পড়লো যে ইদানিং কয়েকটি শনিবার তোমার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। সেদিনই বোধ হয় বলছিলে যে আজকাল শনিবার বিকেলে তুমি কোথায় যেন জার্মান ক্লাস করতে যাও। এই প্রথম তুমি আমায় সত্যি কথা বলোনি প্রবাল। ট্রামের ভিতর তোমার মেঘের মতো অন্ধকার মুখ দেখেই আমি বুঝেছিলাম যে তুমি আমার কাছে আজ একবার আসবে, কারণ ওরকম মুখের চেহারা হওয়ার মতো মনের

অবস্থা তোমার যখন হয়, তখন তুমি আমার কাছেই আসো, আর কোথাও যাও না। যাক সে কথা, রুপালীকে বসিয়ে রেখেছি অনেকক্ষণ, তুমি এলে বাড়ি পৌঁছে দেবে বলে। কোথায় গেল রুপালী? ওঠো, ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো।…রুপালী!"

ভিতরের পর্দা ঠেলে রুপালী বেরিয়ে এলো।

রুপালীকে দেখে প্রবাল আকাশ থেকে পড়লো। সেও যে এখানে থাকতে পারে সে ভাবতেই পারেনি।

প্রবালের কান দুটো লাল হয়ে গেল। রুপালী তা'হলে সব কিছু শুনেছে! রুপালী এসে আর দাঁড়ালো না, ধরা গলায় কোনো রকমে বললো, "কাউকে পৌঁছে দিতে হবে না। আমি একাই যেতে পারবো," বলে চলে গেল কারো কোনো কথা শোনবার অপেক্ষা না করে।

রুপালী চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ কারো মুখে কোনো কথা নেই।

একটু পরে প্রবাল জিজ্ঞেস করলো, "রুপালী যে এখানে ছিলো আমায় আগে বলোনি কেন?

"বলবার সুযোগ পেলাম কোথায় প্রবাল?" সুমিতা উত্তর দিলো।

"রুপালী কি ভাবলো বলো তো?"

সে কথার কোনো উত্তর দিলো না সুমিতা। আস্তে আস্তে বললো, "শ্যামলীর কথা আমায় আগে বলোনি কেন প্রবাল? আমি কি তোমায় আটকে রাখতাম?"

প্রবাল কোনো উত্তর দিলো না।

"প্রবাল, আমায় ছাড়া তোমার যে চলে না এ কথা বার বার জানবার জন্যে কি তোমায় প্রত্যেকবারেই অন্য কোথাও ঘা খেয়ে আবার আমার কাছে ফিরে আসা দরকার?"

প্রবাল চুপ করে রইলো।

"তুমি বড্ডো লজ্জা পাচ্ছো প্রবাল। এত স্মার্ট তুমি, তোমার মুখে কথার খৈ ফোটে, আজ তুমি যে একেবারে চুপচাপ! ব্যাপার কি?"

প্রবাল সিগারেটের অবশেষটুকু ছাইদানে ফেলে দিলো।

"আজো তুমি বুঝতে পারোনি নিজেকে, তোমার জন্যে সত্যি মায়া হয়," বললো সুমিতা।

জানলা দিয়ে দমকা হাওয়া এলো। প্রবালের চুলগুলি এলোমেলো হয়ে কপালের উপর এসে পড়লো। সুমিতা বসে পড়লো সোফার হাতলে, আঙুল দিয়ে চুলগুলি সরিয়ে দিলো।

"তোমার সম্বন্ধে আমার কোনো দুর্ভাবনা নেই, তাই তোমায় যা খুশি করতে বাধা দিই না। জানি, তুমি ঘুরে ফিরে আবার আমারই একপাশে এসে চুপ করে বসে পড়বে।"

সুমিতার ঝি এসে চা রেখে গেল এদের জন্যে। প্রবাল আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে নিলো।

"এতে হয়তো তোমার কোনো ক্ষতি হয় না," সুমিতা বললো," কিন্তু অন্যান্য অনেকের ক্ষতি হয়তো হয়। অন্তত আজ তাই মনে হোলো রূপালীর মুখ দেখে। ও আমায় কিছু বলেনি, কিন্তু ওকে দেখে আমার তো কিছু বুঝতে বাকি নেই। ও এত ছেলেমানুষ, মনের ভাব ওর চোখে মুখে ফুটে ওঠে, ঢাকতে পারে না।"

সুমিতা চা ঢেলে দিলো।

প্রবাল চায়ের পেয়ালা তুলে নিলো।

সুমিতা বলে চললো, "ওর জন্যে আমার মন আজ সত্যিই খারাপ হয়ে আছে। ও আমার আণ্ডারে কাজ করে, ওকে ছোটো বোনের মতো ভালোবাসি আমি, এত ভালো মেয়েটি! আমি ভাবতে পারিনি তুমি ওর মনে কোনো রকম ভুল ধারণা হবার সুযোগ দেবে।"

দূরে কোথায় যেন ঘড়িতে প্রহর বাজলো মিষ্টি বাজনার সুরে।

"আর শ্যামলীইবা তোমায় কি ভাবলো শুনি? আজ লজ্জায় আমারই মাথা কাটা যাচ্ছে। আঁচ তো করতে পারছি সবই। রুপালী নিশ্চয়ই ওর দিদিকে ওর মনের কথা খুলে বলেছে এ কথা না জেনে যে ইতিমধ্যে ওর দিদি মন খুলে বিশ্বাস করে ফেলেছে তোমার এলোমেলো কথাগুলো, যা তুমি কেন বলো নিজেই জানো না।"

প্রবাল জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো আকাশের চাঁদ, যার প্রতিবিম্ব টলমল করছিলো গঙ্গার ধারে শ্যামলীর চোখের জলে। দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আরতির ঘণ্টার প্রতিধ্বনি আবার ফিরে এলো প্রবালের মনে, তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল তার রেশ।

কানে ভেসে এলো সুমিতা বলছে, "শ্যামলীকে তুমি কি বলেছো, সে তো বুঝতে পারছি। তুমি নিরিবিলি জীবন ভালোবাসো না, তুমি চাও ঝড়ের মতো জীবন। এমন মেয়ের ভালোবাসা তুমি চাও যা তোমায় চুরমার করে নতুন ছাঁচে ঢেলে আবার গড়ে নেবে নতুন করে, যা জীবনের নতুন মানে খুঁজে দেবে তোমায়, যা তোমায় বান-জাগা নদীর মতো এপার থেকে ভেঙে নিয়ে ওপারে আঁছড়ে ফেলবে, এমনিতরো সব আবোল তাবোল কথা। কেমন, তাই না?

প্রবাল একটু হাসলো।

"মানলাম তুমি এমন একজনকে খুঁজে পেলে," সুমিতা বলে চললে, "যে তোমার জীবনে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, ভূমিকম্প সব কিছু আনবার প্রতিশ্রুতি দিলো। তারপর? তারপর তো ঘুরে ফিরে সেই বালিগঞ্জে আড়াইখানা ঘরের দখিন খোলা ফ্ল্যাট, জানলার পাশে বসে আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাসে তোমার মনোনিবেশ, তোমার ঝঞ্ঝাময়ী বধূর রান্নাঘরে ইলিশমাছ রন্ধন, আর খাওয়া দাওয়ার পর বাজারে নতুন ওঠা শাড়ির জন্যে শ্রীমতীর বায়নায় কর্ণপাত না করে তোমার নাক ডাকিয়ে ঘুম।"

সুস্মিতা চোখের চাউনি দিয়ে স্নেহের কুহেলি জড়িয়ে দিলো প্রবালের চারপাশে।

"যে মেয়েকে দু'মাস আগেও তুমি চিনতে না, সে মেয়ে তোমার মনের তেষ্টা মেটাতে পারবে এটা তুমি কি করে আশা করো প্রবাল? আর আমি যে ছেলেবেলায় সেই একসঙ্গে চোরপুলিশ খেলার সময় থেকে আজো তোমার পাশে পাশে আছি, আমার কাছ থেকে তোমার কোনো প্রত্যাশা নেই!"

ভারী হয়ে এলো সুস্মিতার গলা। প্রবাল চোখ তুলে তাকালো।

সুস্মিতার চোখে কোনোদিন জল দেখেনি, মুখে হাসিই দেখেছে সব সময়।

আজ হাসির সঙ্গে চোখের জলও দেখলো।

"তুমি আজ আমায় খোলাখুলি বলো প্রবাল, কি তুমি আমার মধ্যে পাচ্ছো না, যা তুমি অন্য মেয়ের কাছে পাবে বলে আশা করো।"

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে প্রবাল কাপটি নামিয়ে রাখলো।

সুস্মিতার গলা ধরে এলো। "আমরা সেই ছেলেবেলা থেকে বন্ধু, এত চুলোচুলি, এত ঝগড়া, এত ভাব আমাদের, কেউ কাউকে চোখের আড়াল করে থাকতে পারিনি, একসঙ্গে পড়ে এসেছি এতদিন, সেই কে-জি থেকে এম-এ পর্যন্ত—আর মুখ ফুটে না বল্লেও তুমিও জানো, আমিও জানি, আমি কতোখানি ভালোবাসি তোমায় আর তুমি ভালোবাসো আমাকে। এ ভালোবাসার যেন কোনো দাম নেই, সেটা তোমায় পরশপাথরের ক্ষ্যাপার মতো খুঁজে বেড়াতে হোলো অন্য জায়গায়, আর আমায় এদ্দিন ধরে তাও দেখতে হোলো মুখ বুজে, চোখ খুলে।"

প্রবাল আস্তে আস্তে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

আঙুল দিয়ে টিপ করে সিগারেটখানি ছুঁড়ে দিলো বাইরের অন্ধকারে, আর আগুনের ফুলকি দিয়ে অধিবৃত্তের বক্ররেখা এঁকে সেটি বহুদূরে গিয়ে পড়লো॥

"আমি জানি তোমার মনে কাঁটা বিঁধছে কোথায়," সুমিতা বলে চললো, "হয়তো ভাবছো তোমার সঙ্গে আমার খাপ খাবে না শেষ পর্যন্ত, কারণ আমি একটি ভালো চাকরি করি আর তুমি আজ এ ব্যবসা ধরছো, কাল ও ব্যবসায় হাত দিচ্ছো, নিজের লাইন ঠিক মতো বেছে নিতে পারোনি এখনো, আর ভয় হচ্ছে শেষ পর্যন্ত যদি কিছুই করতে না পারো, আমি হয়তো শেষ কালে আপসোস করবো, তোমার কোনো মর্যাদা থাকবে না আমার কাছে। এই তো?"

একটু অস্থিরতা দেখা গেল প্রবালের মধ্যে। সে ফিরে এসে সোফায় বসে পড়ে একটি সিগারেট ধরালো।

সুমিতা একটু হাসলো। "আমায় তুমি এই ভাবলে শেষ পর্যন্ত! তোমার নিজের উপর যদি বিশ্বাস না থাকে, আমায় এসে বলতে পারলে না?"

প্রবাল চুপ করে রইলো।

"তা ছাড়া তোমাদের মনে এখনো পঞ্চাশ বছর আগেকার ধারণাগুলো কেন বজায় আছে বলো তো? স্বামী স্ত্রী দুজনেই যদি কাজ কর্ম করে, স্বামী স্ত্রীর চেয়ে বেশী প্রতিষ্ঠা না পেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? স্ত্রী যদি স্বামীর চেয়ে বেশী কৃতী হয় জীবনে, কি আসে যায় তাতে? সংসারের গণ্ডির ভিতর স্বামী আর স্ত্রী স্বামী-স্ত্রীই, বাইরের পৃথিবীতে ওরা যাই হোক না কেন।"

প্রবাল কি যেন ভাবতে লাগলো।

সুমিতা বলে গেল, "দু'বছর আগে বাবা যখন বিয়ের কথা পেড়েছিলেন, তুমি বছর খানেক সময় চেয়েছিলে। মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে অনেক দিন, যা করতে পারবে ভেবেছিলে, পারলে না—মনে হচ্ছে সরে যেতে পারলে ভালো হয়, অথচ এমনি এমনি সব সম্পর্ক চুকিয়ে যেতে মন সরছে না, তাই এখন অন্য কাউকে উপলক্ষ করে পালিয়ে যেতে চাইছো আমার কাছ থেকে, তাই না?"

কোনো উত্তর এলো না প্রবালের মুখে।

"প্রবাল, তুমি যদি বলো তো আমি চাকরি ছেড়ে দিই। তা'হলে খুশী হবে ?"

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলে চললো।

প্রবাল চোখ তুলে সুমিতার দিকে তাকালো।

দেখলো, সুমিতা নিস্পলক তাকিয়ে আছে তার দিকে।

"কিংবা, তুমি যদি আমায় ছেড়ে চলে যেতে চাও তো চলে যাও, আমি বাধা দেবো না," সুমিতা বললো অনেকক্ষণ পরে।

প্রবাল উঠলো না। বসেই রইলো।

"একটা ভালো খবর আছে," ডলি দেশরাজ বললো রজতকে।

"কি ?"

"আমি ডিরেক্টারের পি-এ হয়েছি। আগের পি-এ, যে এদ্দিন ছুটিতে ছিলো, অন্য জায়গায় চাকরি নিয়ে চলে গেছে। কাল চার্জ বুঝে নিয়েছি। আমার কাছে তোমার খাওয়া পাওনা হোলো।"

"কেন ?"

"শর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিং শেখার বুদ্ধি তো তুমিই দিয়েছিলে—।"

"ও।" হাসলো রজত। ডলির পদোন্নতির খবর শুনে খুব খুশী হোলো।

"এ রোববার আমজাদিয়ায়, কেমন ?" ডলি বললো।

"বেশ।"

"আরো একটি ভালো খবর আছে।"

"কি ?"

"ডিরেক্টারকে তোমার কথা বলেছি।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যা। উনি বলেছেন আগামী হপ্তায় একদিন তোমায় নিয়ে যেতে—।

এবার তোমার কাছে আমার একটি সিনেমা দেখা পাওনা হোলো। এ রোববার নিউ এম্পায়ারে। কেমন?"

দুপুরে অফিস থেকে ফিরেই একটু অসুস্থ বোধ করছিলেন উমাকান্ত। খেলেন না কিছুই। শুধু এক কাপ চা খেয়ে শুয়ে পড়লেন।

এক সময় নীরজা পাশে এসে বসলেন।

উমাকান্ত তাকিয়ে দেখলেন নীরজাকে। রোগা হয়ে গেছে।

"আজকাল বাড়িটা বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তুমি কবে রিটায়ার করছো," নীরজা জিজ্ঞেস করলেন উমাকান্তকে।

"মাস খানেকের মধ্যেই।"

"ওরা আর বাড়িয়ে দেবে না?"

"উঁহু

"তুমি চাকরিতে থাকতে থাকতে রুপুর বিয়ে দিতে পারলে ভালো হোতো।"

উমাকান্ত চুপ করে রইলেন।

"আমার বাড়িতে একা একা ভালো লাগে না," বলে চললেন নীরজা, "শ্যামলী উত্তরপাড়ায়, রুপু সারাদিন আপিসে, রজত সারাদিন বাইরে বাইরে, কোথায় যায়, কি যে করে বুঝি না। সেদিন দেখলাম একটি দামী স্যুট করিয়ে এনেছে। কি জানি টাকা পেলে কোত্থেকে, কেউ তো কাউকে কিছু খুলে বলে না। বাড়িটা হোটেল হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু খাওয়া আর রাত্তিরে শোয়ার জন্যেই যেন বাড়িতে থাকা।"

"আরেকটু কাছে এসে বোসো নীরা—।"

অনেক দিন আগেকার আদরের ডাক। নীরজার বুক টনটন করে উঠলো।

"কেন?"

"আজ শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। ওরা সবাই কখন আসবে?"

"রজত কখন ফেরে ঠিক নেই। রুপু নিশ্চয়ই সন্ধ্যে নাগাদ এসে পড়বে। আজ শ্যামলীও আসবে। তুমি রাত্তিরে কি খাবে?"

"কিচ্ছু না—।"

"হরলিক্স করে দেবো?"

"তা দিতে পারো এক কাপ।"

শ্যামলীকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিলো প্রবাল।

সে চুপচাপ উপরে উঠে এসে দেখলো রুপালী বাড়ি নেই, রজত তো নেইই। নীরজা রান্নাঘরে। উমাকান্ত চুপচাপ খাটে শুয়ে আছেন।

"এই অবেলায় শুয়ে কেন বাবা?" শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো।

"শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে মা।"

শ্যামলী পাশে বসে চুলে আঙুল বুলোতে লাগলো।

কেউ কোনো কথা বললো না।

ছেলেবেলায় হারানো নিজের মায়ের কথা মনে পড়লো উমাকান্তর। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এলো।

শ্যামলী জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো ও বাড়ির ছাতের আড়ালে এক টুকরো আকাশের বুকে গাঁথা চাঁদকে।

চাঁদ তো তার দিকে তাকিয়ে আছে সেই সন্ধ্যে থেকে, প্রবাল যেমনি করে তাকাতো। চোখের পর্দায় চাঁদ হঠাৎ এক জাবড়া আলো হয়ে ভাসতে লাগলো।

সিঁড়ি দিয়ে ঠক ঠক করে উঠে এলো কে যেন, পায়ের আওয়াজ শুনেই বুঝলো সে রুপালী। স্কুলে মাস্টারের কাছে বকুনি খেলে ঠিক এমনি করেই দুমদাম করে উঠে আসতো সে।

রুপালী এঘরে এলো না। শ্যামলী বুঝলো যে একটা কিছু হয়েছে।

উঠে এলো রুপালীর ঘরে।

"কি হয়েছে রে রুপু ?"

রুপালী তখন জামা কাপড় জুতো কিছু না ছেড়ে শুয়ে পড়েছে বিছানায়, মুখ গুঁজে দিয়েছে বালিশে,—তার চিরকালের অভিমানের ভঙ্গি।

কাছে গিয়ে বসলো শ্যামলী।

"কী হোলো তোর ?"

"তুমি যাও এখান থেকে," রুপালী চেঁচিয়ে উঠলো, "আমি তোমার মুখ দেখতে চাইনে। কে তোমায় বলেছিলো প্রবাল দা'র কাছে আমার বিয়ের কথা পাড়তে। কেন তুমি আমায় আগে বলোনি যে তোমাদের মধ্যে এত ভাব, এত দেখা হওয়া গঙ্গার পাড়ে ? কেন তুমি আমার এতদিনকার সব গর্ব সব কিছু জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিলে ? তুমি সুন্দর দেখতে, যা কিছু ভালো সব তোমার, সব পাও তুমি। আমি দেখতে ভালো নই, তাই আমি কিছু চাই না কারো কাছে, কিছু পাবো না বলে। কেন তুমি আমার এটুকু সম্মান রাখলে না ওদের কাছে ? চলে যাও এখান থেকে, তোমার মুখ আমি আর দেখবো না, কোনোদিন না—," বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো রুপালী

নীরজা এসে দাঁড়ালেন দোর গোড়ায়। কোনো কথা বললেন না।

ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা। হাওড়া থেকে বাস পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, শ্যামলী ভাবলো।

উঠে পড়লো সে। কাউকে কোনো কথা বললো না। যেমনি চুপচাপ এসেছিলো, তেমনি চুপচাপ বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

নীরজা একটি কথাও জিজ্ঞেস করলেন না। যেমনি চুপচাপ দরজা খুলে দিয়েছিলেন তাকে, তেমনি চুপচাপ দরজা বন্ধ করে দিলেন শ্যামলী বেরিয়ে যেতেই।

একটু পরে একটি হিন্দি গানের সুর শিস দিতে দিতে রজত ঘরে এসে ঢুকলো।

*   *   *   *   *

তারপর দিন সকালে টেলিফোনে খবর এলো উত্তরপাড়ার বাড়িতে, শ্যামলীর কাছে।

রাত্তিরে হার্টফেল করে মারা গেছেন উমাকান্ত। রজত রুপালী কেউ কাছে ছিলো না। নীরজাও ঘুমুচ্ছিলেন। কেউ জানতে পারেনি। জানা গেছে সকালবেলা সবার ঘুম ভাঙবার পর।

খবরটা শুনে চুপচাপ বসে রইলো শ্যামলী।

বাপের জন্যেও তার চোখে জল এলো না।

চোখের যতো জল সব আগের দিন রাত্তিরেই ঝরে ঝরে ফুরিয়ে গেছে।

॥ সাত ॥

তখনো পুজোর মাসখানেক বাকি।

পুজোর ছুটিতে গোপালপুর যাওয়ার সম্ভাবনা আলোচনা করছিলো মোহিত চ্যাটার্জি আর ক্ষমা।

দীপালী এক টুকরো সিল্কে রঙিন ফুল তুলছিলো একপাশে বসে।

হঠাৎ বললো, "ভাবছি রজতকেও সঙ্গে নেবো।"

"তা'হলে তোমরাই যেয়ো। আমি গিরিডি যাবো পিসীর কাছে," ক্ষমা উত্তর দিলো।

"রজতকে নিতে চাইলেও যাবে বলে মনে হয় না," মোহিত বললো, "ওকে সেদিন ওর সেই পাঞ্জাবী বন্ধুটির সঙ্গে দেখলাম মেট্রোতে।"

"তুমি রজতের জন্যে কিছু আর করলে না।" দীপালী ফ্রেমটি একপাশে রেখে দিলো। "বেশ, এবার দেখছি যা করবার আমাকেই করতে হবে।"

"বেশ তো। তোমায় কতবার বলেছি, তোমার পক্ষে কাউকে বলা অনেক সুবিধের। তুমি যে কোনো কাউকে খুব ইনফর্ম্যালি বলতে পারো। আমার পক্ষে চট্ করে কারো অবলিগেশানে যাওয়ার অনেক অসুবিধে আছে। বলতে আমি অনেককেই পারি, আমার কথা রাখবেও। কিন্তু মনে করো তারপর যদি আমাকে দিয়ে কাজ গুছোতে চায়, আমার পক্ষে সেটা এড়ানো শক্ত হবে, অথচ করে দেওয়াও বাঞ্ছনীয় না হতে পারে।"

"ভাবছি শেঠ রতনলালকে আমি নিজেই একদিন বলবো—।"

"রতনলালকে? তুমি? তা বলতে পারো, উনি তোমায় খুব শ্রদ্ধা করেন, প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন তোমার কথা। কিন্তু কোম্পানির একজন ডিরেক্টারের স্ত্রী কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে ধরছে নিজের ভাইকে একটি সাধারণ কাজ দেওয়ার জন্যে, সেটা খুব শোভন হবে কিনা একবার

ভেবে দেখলে ভালো হয়। বলতে তো আমিও পারতাম। কিন্তু রজতকে আমাদের ফার্মে সামান্য কাজ দিতে চাইনে, আর ওকে নেওয়া যেতে পারে এরকম ভালো কাজ আপাতত খালি নেই। ওর যদি টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশন থাকতো ওকে আমি খুব বড়ো চাকরি দিতে পারতাম।"

"আমি অতো কথা বুঝিনে," দীপালী বললো, "তোমায় আর সাতদিন সময় দিলাম। তুমি এর মধ্যে কাউকে না বললে আমি নিজে বলবো।"

মোহিত একটু ভাবলো।

তারপর বললো, "দেখ এখন বলেও কোনো লাভ হবে না। অফিসে গোলমাল চলছে। অফিসে মিলে ফ্যাক্টরিতে সবাই জোট বেঁধে স্ট্রাইক করবার চেষ্টায় আছে। এ গোলমালটা মিটে যাক। তারপর দেখা যাবে।"

সেদিন দুপুরে রজত আসতে দীপালী বললো, "দ্যাখ, ওঁদের অফিসে কি সব গোলমাল চলছে, স্ট্রাইক না কি যেন সব ব্যাপার। ওসব মিটে যাক, তারপর যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। শ্যামলীর কি খবর?"

"ভালোই আছে," রজত আনমনে উত্তর দিলো।

"এসেছিলো ইতিমধ্যে?"

"খুব বেশী তো আসে না আজকাল, এলেও এমন সময় আসে যখন আমি বাড়ি থাকি না, আর রূপালী থাকে অফিসে। এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করে চলে যায়।"

রজত উঠে পড়লো।

"এরই মধ্যে উঠে পড়ছিস? চা খেয়ে যা," দীপালী বললো।

"না, আরেকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সময় হয়ে এলো," বলে রজত উঠে পড়লো।

তখন সাড়ে পাঁচটা। চৌরঙ্গিতে আসতে আসতে ছ'টা বাজলো।

এসে দাঁড়ালো গ্র্যাণ্ড হোটেলের নীচে বাটার জুতোর দোকানের সামনে।

দশ মিনিট কেটে গেল। জনতার স্রোত বয়ে চললো তার পাশ দিয়ে, তাকে ভ্রূক্ষেপ না করে। সে কিন্তু চলতি জনতার মধ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগলো তাকে, যার অপেক্ষায় সে এসে দাঁড়িয়েছে। করুণ ব্যাঞ্জো বাজাতে বাজাতে সামনে দিয়ে চলে গেল সাদা প্যাণ্ট সাদা হাফ সার্ট আর মাথায় টুপি পরা এক অন্ধ। বৃথা ভিক্ষে চেয়ে ফিরে গেল জীর্ণ বসন পরা এক দরিদ্র গৃহস্থ বধূ।

রজত চঞ্চল হয়ে উঠলো।

তার দেখা নেই কেন? ভেবেছিলো হয়তো তার নিজেরই দেরি হয়েছে।

হঠাৎ পেছন দিক থেকে মিষ্টি ডাক এলো, "রজত—!"

রজত ফিরে তাকালো।

"বড্ড দেরি হয়ে গেল," ডলি বললো, "আজ আমায় বস্-এর কাছে ডিক্টেশান নিতে হয়েছে। উঃ, বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, চলো কোথাও বসে চা খাওয়া যাক।"

পথ চলতে চলতে ডলি বললো, "জানো, আমাদের অফিসে বড্ড গোল-মাল চলছে। স্ট্রাইক হবে বোধহয়। কাল ফ্যাক্টরিতে একজন এসিস্ট্যাণ্ট লেবার অফিসারকে এমন মার মেরেছে! ভালোই হোলো। ওর চাকরিটা বোধ হয় খালি হবে।"

"কেন?" অবাক হোলো রজত।

"ও খুব মস্তো বড়ো লোকের ছেলে। সামনের মাসে ওর বিয়ে। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই বিলেত যাওয়ার কথা। আজ ওর বাবা এসে ডিরেক্টারকে যা' তা' বলে গেল। বললে, তোমরা অপদার্থ, ইউস্‌লেস্, আমার ছেলেকে প্রোটেকশান দিতে পারোনি! বলেছে, কালই আমার ছেলের রেজিগ্‌নেশান পাঠিয়ে দেবো।"

"তাই নাকি?" রজত পুলকিত হোলো।

"এসব কথা শুনে আজ আমি দু'ঘণ্টার কাজ এক ঘণ্টায় করেছি, তার উপর অফিস ছুটির পরও এক ঘণ্টা বসে অনেক কাজ করেছি ডিরেক্টারের সঙ্গে। কাজ করতে করতে একটু একটু গল্পও করেছি। যারা স্ট্রাইক করে, তাঁদের গালাগাল দিয়েছি। ডিরেক্টার খুব খুশী। বললে, তোমরা পাঞ্জাবী কিনা, তাই খেটে খাওয়ার মর্যাদা বোঝো। যতো খাটবে, টাকা কামাবে। খাটবেনা, টাকা কামাবেনা—সোজা কথা। আর এই বাঙালীদের দেখ—কাজ করবে না, শুধু আজ এডভান্স চাই, কাল ছুটি চাই, পরশু ইনক্রিমেণ্ট চাই, তারপর বারো মাসে চব্বিশটা বোনাস চাই। অফিস তুলে নিয়ে যাবো কলকাতা থেকে। বোম্বেতে দেখ ওরা কি রকম আরামে বিজনেস্ করে—আমি শুনে খুব হ্যাঁ, হ্যাঁ, করে গেলাম। ওই লোকটার রেজিগনেশান আসুক, তারপর তোমার কথা বলবো, কেমন? স্যুটটা ইস্তিরি করিয়ে রেখো কিন্তু।"

রজতের সঙ্গে গল্প করতে করতে জনতার স্রোত কাটিয়ে এগিয়ে চললো ডলি দেশরাজ। চোখে পড়লো না যে চৌরঙ্গি প্লেসের মোড়ে সিগারেট কিনছিলো তাদেরই চেনা একজন। এদের দেখে একটু বিশেষ আগ্রহ নিয়ে তাকালো, তারপর একটু মুচকি হাসলো নিজের মনে।

রজত আর ডলি দেশরাজ চলে গেল নিউ মার্কেটের দিকে। মার্কেটের ভিতরের স্টলগুলো খুব নিরিবিলি, আর ওদের প্যাটিস্‌ও সস্তা। চৌরঙ্গির রেস্তরাঁগুলিতে বড্ড দাম। ওরা তাই সাধারণত চা খেতে যেতো নিউ-মার্কেটের ভেতরের কোনো না কোনো চায়ের স্টলে।

আর চৌরঙ্গি প্লেসের মোড়ে দাঁড়িয়ে রইলো প্রবাল মুখার্জি। একটি সিগারেট ধরালো। ভাবলো, কোথায় যাওয়া যায়।

নাঃ, বাড়িই ফেরা যাক, স্থির করলো প্রবাল।

হাঁটতে হাঁটতে স্থরেন ব্যানার্জি রোডের মোড়ে বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু বাসে ওঠা আর হোলো না। দেখলো, প্রসাদ নামছে একটি বাস থেকে।

প্রসাদ দেখতে পেলো প্রবালকে।

"আরে, তুই ? কি রকম আছিস, অনেক দিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি।"

"কোত্থেকে হবে বল," প্রবাল বললো, "তুই তো আজকাল আমাদের বাড়ি আসিস না।"

"ভাই, আজকাল বড্ড ব্যস্ত আছি নানা রকম ঝঞ্ঝাটে।"

"তোর ঝঞ্ঝাট তো শুনে আসছি গত পাঁচ বছর ধরে।"

"আমাদের ঝঞ্ঝাট তো থাকবেই। তোদের মতো সুখের জীবন তো আমাদের নয়।"

"আমাদের জীবন খুব স্থখের, না ?" প্রবাল হাসলো।

"যাই হোক, আমাদের মতো ঝঞ্ঝাট তোদের পোয়াতে হয় না। আমরা লেবারার মানুষ, ফ্যাক্টরির সুপারভাইজার; তার উপর ট্রেড ইউনিয়ানের কাজ, ঝঞ্ঝাট আমাদের নয়তো কার—।"

"তারপর, কি খবর বল," প্রবাল জিজ্ঞেস করলো।

"খবর আর কি! ফ্যাক্টরিতে স্ট্রাইক করানোর তোড়জোড় চলছে। রতনলালের বড্ড দেমাক হয়েছে। সায়েবদের আমলে যতো না বজ্জাতি ছিলো, এদের হাতে ফার্মগুলি আসবার পর আরো বেড়েছে।"

"রতনলাল ? তোদের ফ্যাক্টরিতেও তার ইণ্টারেস্ট আছে নাকি ?"

"কোথায় নেই বল ? আমাদের উইলিয়ামসন কোম্পানির ফ্যাক্টরি, পানামা কোল্ড স্টোরেজ এ্যাণ্ড রেফ্রিজারেটার্স, ব্লু-ওয়েদার এ্যাণ্ড কক্‌রেন, গোটা তিন জুট মিল, একটি ব্যাঙ্ক, একটি ফিল্ম প্রোডাকশান আর ডিস্ট্রিবিউশান—সব কিছু নিয়ে তার বিরাট সাম্রাজ্য। সে আবার মাইনে দিয়ে বাঙালী ডিরেক্টারও রেখেছে। এমন ভোগাতে আরম্ভ করেছে

কর্মচারী, শ্রমিক, মজুরদের,—এবার সবাই মিলে এক জোট হয়ে স্ট্রাইক না করলেও ব্যাটারা ঠাণ্ডা হবে না।"

"স্ট্রাইক হচ্ছে কেন?"

"ভাই, আর বলিস নে। বহুকাল ধরে রেওয়াজ চলে আসছে অফিসের আর ফ্যাক্টরির বাবু আর মজুরেরা পূজোর সময় এক মাসের মাইনে বোনাস পাবে। এ বছর সব পাল্টে দিতে চায় ওরা। পুজোর আর একমাস বাকি, ঝট করে নোটিস দিলে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সুবিধের নয়, কোম্পানি লস্ দিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে, তাই এ বছর আর পূজোর বোনাস দেওয়া হবে না। ইউনিয়ান থেকে আমরা সবাই গিয়ে চেপে ধরলাম, দেওয়া হবে না কি রকম? ব্যালেন্স শীট খুলে, একাউন্ট্স্ ঘেঁটে নানা রকম তথ্য যোগাড় করে দেখালাম যে কোম্পানিগুলো গত বছর অনেক টাকা মুনাফা করেছে, শেয়ার-হোল্ডারদের মোটা ডিভিডেণ্ড দিয়েছে। বললাম যে বোনাস না দিলে আমরা স্ট্রাইক করবো। ওরা তখন বললে, আচ্ছা, ব্যাপারটা ট্রাইবিউন্যালে দাও। কিন্তু ওসব করতে গেলে সময় নষ্ট, ট্রাইবিউন্যাল পূজোর আগে কিছু করে নাও উঠতে পারে। তবু আমরা বললাম, আচ্ছা, ট্রাইবিউন্যালে দিচ্ছি, কিন্তু উপস্থিত আমাদের একমাসের মাইনে আগাম দেওয়া হোক। কর্তারা শুনবে না সে কথা। চোখ রাঙালে, ধমক দিলে, শাসালে। আমরা বললাম, তা হলে আমরা কাজে আসবো না। ওরা দু'চারজনকে ছাঁটাই করে দিলে। আজ আমরা স্থির করেছি যে কোম্পানিকে নোটিস দেওয়া হবে—যদি একমাসের মাইনে আগাম দেওয়া না হয়, আর ছাঁটাই করা কর্মীদের কাজে বাহাল করা না হয়, সমস্ত অফিসে, মিলে, ফ্যাক্টরিতে স্ট্রাইক হবে। নোটিস কবে দেওয়া হবে সেটা সামনের মিটিঙেই স্থির হবে।"

এক নিশ্বাসে দীর্ঘ বক্তৃতার মতো বলে গেল প্রসাদ।

"খুব গোলমেলে ব্যাপার দেখছি—," প্রবাল বললো।

"হ্যাঁ ভাই, খুব। ও হ্যাঁ—ভালো কথা, হরিদাসকে নিয়ে আমরা যে মেয়েটিকে দেখতে গিয়েছিলাম, সেই যে রুপালী যার নাম, তুইই তো তাকে পানামা'তে ঢুকিয়েছিস সুমিতা গুহকে বলে, তাই না?"

"হ্যাঁ—। কেন?"

"ও সাংঘাতিক মেয়ে—।"

"সে পরিচয় তো সেদিনই পেয়েছিলি—।"

"না, না, খুব সাংঘাতিক রকম ভালো। সম্প্রতি ওর সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা হয়ে গেছে। নানা কাজে এক সঙ্গে থাকতে হচ্ছে তো!"

"ও আবার তোমাদের কোন্ কাজে থাকছে?" প্রবাল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

"জানিস না বুঝি! রুপালী ওদের অফিসের এমপ্লয়িজ ইউনিয়ানের একজন মস্তো পাণ্ডা। ওকে দেখতে গিয়ে যে রকম ছেলেমানুষটি দেখেছিলাম আজকাল ওরকম আর নেই। অনেক বদলে গেছে। সেদিন কর্মচারিদের সভায় আগুনের মতো বক্তৃতা দিলে।"

"তাই নাকি," মনে মনে একটু আশঙ্কিত হোলো প্রবাল। রুপালী এসবের মধ্যে!

"এসব মিটে যাক, তারপর একদিন আসবো তোর ওখানে।"

"হ্যাঁ, আসিস একদিন," প্রবাল বললো।

প্রসাদ হেঁটে চলে গেল ধর্মতলার দিকে।

প্রবাল বাড়ি ফিরলো, অনেকক্ষণ ভাবলো—তারপর একটি চিঠি লিখতে বসলো।

দিন দুই পর সুমিতার ঘরে প্রবাল একলা চুপচাপ বসেছিলো সুমিতার অপেক্ষায়। একটু দেরি করেই ফিরলো সুমিতা।

গা ধুয়ে এসে বসতে ঝি এসে চায়ের ট্রে রেখে গেল। পেয়ালায় চা

ঢালতে ঢালতে স্থমিতা বললো, "শুনলাম শ্যামলী ফিরে এসেছে। রূপালী বলছিলো।"

"তাই নাকি ?" প্রবাল ঈভ্‌স্ উইকলির পাতা উল্টে যেতে লাগলো।

"বহুদিন পর শ্যামলী বাড়ি ফিরলো। বছর খানেক তো ওদের সঙ্গে বশেষ কোনো সম্পর্কই রাখেনি। যতো দোষ তোমার প্রবাল, মিছিমিছি মেয়ে ছুটিকে ভোগালে, কারো কোনো লাভ হোলো না, মাঝখান থেকে বোনেদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।"

প্রবাল কোনো উত্তর দিলো না। একটি সিগারেট ধরিয়ে নিলো।

"এবার হঠাৎ ফিরলো কেন কে জানে। রূপালীকে জিজ্ঞেস করলাম। সে কিছু বলতে পারলো না। বললে, শ্যামলী কাল সন্ধ্যায় হঠাৎ এসে উপস্থিত। এসে সে বললে, তোরা সব কেমন আছিস দেখতে এলাম। — এখানে নাকি থাকবে কয়েকটা দিন—আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না সে কেন এলো।"

"শ্যামলীর এখানে আসায় তুমি খুব খুশী হয়েছো বলে মনে হচ্ছে না তো। ওর উপর তোমার রাগ গেল না ?"

"শ্যামলীর উপর রাগ ?" স্থমিতা বাঁকা হাসি হাসলো।

"শ্যামলী ফিরে এসেছে শুনে এত চঞ্চল হয়ে উঠলে কেন ?"

"চঞ্চল হবো কেন, পাগল না কি ?"

"ভয় পেয়েছো," প্রবাল হেসে বললো।

"ভয় ?" স্থমিতা চোখ তুলে তাকালো, "ভয় আমি শ্যামলীকে কেন, ক্লিওপেট্রা উর্বশীকেও পাইনে।"

"তবে কেন জানতে চাইছো তার কলকাতায় ফেরার কারণটা— ?"

"তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাইছো না যে সে কলকাতা ফিরে এসেছে আবার তোমারই জন্যে।"

"সত্যি কথা শুনবে ?" প্রবাল জিজ্ঞেস করলো।

সুস্মিতা হাসলো। বললো, "বাজে বোকো না প্রবাল, আজ মেজাজ ঠিক নেই, অফিসে অনেক গণ্ডগোল হয়েছে আজ।"

"শ্যামলী কলকাতা ফিরেছে আমার চিঠি পেয়ে," প্রবাল আস্তে আস্তে বললো।

"মানে?" চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলো সুস্মিতা।

"আমি ওকে চিঠি লিখেছিলাম," এ্যাশ-ট্রে'তে ছাই ঝাড়লো প্রবাল।

"আবার শুরু করেছো এসব পাগলামো?"

"লিখেছিলাম যে এখানে রুপালীদের অফিসে খুব গোলমাল চলছে। অন্তত রুপালীর জন্যে তার ফিরে আসা দরকার।"

সুস্মিতা অবাক হয়ে তাকালো প্রবালের দিকে।

"লিখেছিলাম যে অফিসের স্ট্রাইক ইত্যাদির ব্যাপারে রুপালীও জড়িয়ে-পড়েছে। এসব ব্যাপারের পক্ষে সে অত্যন্ত ছেলেমানুষ। অফিস রাজ নীতির এই দাবা খেলায় রুপালী অন্যের ঘুঁটি হয়ে ঘুরছে। শ্যামলীদের উচিত রুপালীকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে এনে, দেখে শুনে ওর একটি বিয়ে দিয়ে দেওয়া। লেবার মুভমেণ্টের মেয়ের টাইপ রুপালী নয়, ও সাধারণ বাঙালী বাড়ির রান্নাঘরে হাতাখুন্তি নাড়বার টাইপ। ট্রেড ইউনিয়ানের রাজনীতির ঘূর্ণিতে আর যারই উপকার হোক, রুপালী একেবারে তলিয়ে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে ফেলবে—।"

সুস্মিতা একটুখানি তাকিয়ে রইলো প্রবালের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললো:

"এ কথা তুমি লিখতে পারলে?"

"হ্যাঁ,—" সিগারেট-শৃঙ্খলে আরেকটি জুড়ে ~~শ্যামল~~ প্রবাল উত্তর দিলো শিশু-প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পাওয়ার মতো মুখ করে।

"শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া অন্যায়?" সুস্মিতা জিজ্ঞেস করলো।

"অন্যায় নয়, কিন্তু রুপালীর পক্ষে বিপজ্জনক। যদি বুঝতাম ও নিজের

বুদ্ধিতে এসবের মধ্যে ভিড়েছে, আমি ওকে উৎসাহ দিতাম। কিন্তু ও তো নিজের বুদ্ধিতে এর মধ্যে আসেনি, ওকে বোকা পেয়ে তোমরা ওকে এর মধ্যে ঠেলে দিয়েছো, যাতে তোমাদের নিজেদের লোক এর মধ্যে থাকে। তোমরা ম্যানিজারিয়েল স্টাফের লোক, অফিসের রাজনীতিতে তোমাদের স্বার্থ যে অন্য রকম সে কথা বোঝবার বুদ্ধি রূপালীর এখনো হয়নি।"

সুমিতা চুপ করে রইলো একটুখানি। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তোমায় কে বললে যে আমিই ওকে এসবের মধ্যে যেতে উৎসাহিত করেছি ?"

"ওর এসবে ভিড়ে যাওয়ার মধ্যে যে তোমার ম্যানিপ্যুলেশান আছে সে আমি আঁচ করেছি।"

সুমিতা একটু চুপ করে রইলো।

তারপর একটু হেসে বললো, "তুমি আমায় ভুল বুঝছো প্রবাল ?"

"একটুও না। সত্যি করে বলো তো ওকে তুমি এসব কাজে উৎসাহ দাওনি ?"

"হ্যাঁ দিয়েছি, কেন জানো ? অনেক কিছু, যা' আমরা নিজেরা পারি না নানা কারণে, অথচ যার পেছনে আমাদের সমর্থন আছে,——"

"—তার মধ্যে নিজেদের লোক ঢুকিয়ে দিতে পারলে গাছেরও খাওয়া যায়, তলারও কুড়োনো যায়। এই তো ?" প্রবাল একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলো। "সত্যি, তোমরা অফিসার শ্রেণীর লোকেরা কী দুর্ভাগা ! ডিরেক্টারেরা কোনো অন্যায় করলে প্রতিবাদ করবার সাহস তোমাদের নেই, অথচ অন্য কেউ প্রতিবাদ করে তাদের দমিয়ে রাখতে পারলে যে সুবিধে হয় তার লোভ ষোলো আনা আছে। শুধু ঝঞ্ঝাটের ঝড় সাধারণ কেরানী মজুরদের উপর দিয়ে বয়ে গেলেই হোলো। এই তো ?"

সুমিতা আস্তে আস্তে বললো, "প্রবাল, পুরোনো মালিকদের চেয়ে নতুন

মালিকেরা অনেক বেশী অসহ্য হয়ে উঠেছে। ওরা আমাদের মানুষ বলে মনে করে না।"

"সত্যি, কী অন্যায়," প্রবাল হেসে বললো, "কেরানী মজুরদের মানুষ বলে জ্ঞান না করুক, অন্তত অফিসারদের মানুষ বলে জ্ঞান করা উচিত ছিলো—এই তো তোমার বক্তব্য?"

সুমিতা হাসলো, "কী-যা-তা' বলছো প্রবাল?"

"সত্যি কথাই বলছি। এ' হোলো শৌখীন সমাজের সাম্যবাদ। আমার থেকে যারা নীচু তারা নীচুই থাক, আমার থেকে যারা উঁচু, তারা কিন্তু আমার সমান সমান হোক।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো সুমিতা। তারপর বললো, "রূপালী ট্রেড ইউনিয়ানের অন্যান্য কর্মীদের আওতায় এসে কি রকম যেন একটু বদলে গেছে। আজকাল খুব বেশী আসে না আমার কাছে।"

প্রবাল হেসে বললো, "তাই নাকি? চোখ ফুটেছে দেখছি—।"

"ও আজকাল অনেক সিরিয়াস হয়ে গেছে। আগের মতো সেই ছেলেমানুষটি আর নেই। এর জন্যে তুমিই দায়ী প্রবাল!"

প্রবাল খুব হাসলো কিছুক্ষণ ধরে—।

॥ আট ॥

ইউনিয়ানের অফিস থেকে রুপালী আর প্রসাদ বেরুলো এক সঙ্গেই। বাইরে এসে রুপালী প্রসাদকে বললো, "আমায় খানিকটা এগিয়ে দেবেন? একটু কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

পথে নেমে রুপালী জিজ্ঞেস করলো, "শ্যামলীকে মনে আছে? আমার সেই দিদিটি, সেই যে আপনারা যেদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন, আমাদের কথার মাঝখানে বাইরে বেরিয়ে এসে আমায় বকেছিলো?"

প্রসাদের আবছা মনে পড়লো একটি সাদাসিধে কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে মেয়েকে। তার কথা সে পরেও শুনেছে হরিদাসের কাছে।

বললো, "হ্যাঁ, মনে আছে। কেন?"

"ছোড়দি হঠাৎ চলে এসেছেন উত্তরপাড়া থেকে।"

"উনি তো আজকাল উত্তরপাড়াতেই থাকেন, না?"

"হ্যাঁ, আপনি কি করে জানলেন?"

"হরিদাস বলছিলো।"

রুপালী অবাক। "হরিদাস? কোন্ হরিদাস?"

প্রসাদ একটু হাসলো।

চট্ করে রুপালীর মনে পরে গেল। ও, সেই হরিদাস? কান দুটো একটু গরম হয়ে উঠলো। তবু খুব সহজভাবে জিজ্ঞেস করলো:

"হরিদাস বাবু কোত্থেকে জানলেন?"

"হরিদাসের সঙ্গে ওঁর দেখা হয় মাঝে মাঝে। সে প্রায়ই বেড়াতে যায় দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে আপনার দিদিও যান কখনো সখনো।"

"হরিদাস বাবুর সঙ্গে দিদির জানাশুনো আছে জানতাম না তো," রুপালী বললো।

প্রসাদ চুপ করে রইলো।

একটি বাস্ এসে দাঁড়ালো।

উঠে পড়লো ওরা দু'জনে। বাস প্রায় খালি। ওরা একটি সীটে বসে পড়লো পাশাপাশি।

বাস এগিয়ে গেল খানিকটা।

তারপর রুপালী বললো, "দিদি কেন এসেছে জানেন? চাকরি থেকে আমায় ছাড়িয়ে নিতে। ও বলে, এসব আন্দোলনের মধ্যে থাকা আমার পক্ষে ভালো নয়। ও ছেলে দেখছে আমার জন্যে। জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবেই। মা'ও দিদির দলে। দাদাও সায় দিচ্ছে দিদির কথায়। আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছি না।"

"যা কর্তব্য মনে করেন তাই করবেন," প্রসাদ সহজভাবে উত্তর দিলো।

"মায়ের সামনে দিদির সামনে বসে মনে হয় গুরুজনদের খুশী করাই আমার কর্তব্য। বাবা চেয়েছিলেন আমার বিয়ে দিয়ে যেতে। সেই সাধ মেটানোর আগেই তো উনি চলে গেলেন। মা'ও বা কদ্দিন আর বাঁচবেন।—কিন্তু যখন একা থাকি, তখন মনে হয় আমার কর্তব্য আরো বড়ো। আজ যে আন্দোলনের মধ্যে এসে পড়েছি, কাজ শেষ না করেই তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসি কি করে? সে জন্যেই আজ আপনার সাহায্য চাইছি।"

"আমায় কি করতে বলেন?" প্রসাদ জিজ্ঞেস করলো।

"ওদের সঙ্গে তর্ক করতে আমি পারি না, ওদের বোঝাতেও পারি না। আপনি একবার দিদির সঙ্গে দেখা করে বলুন। দিদিকে বোঝালে বোঝে। আমি ঠিক বোঝাতে পারিনে, বাবার কথা উঠলেই আমার চোখে জল আসে, সব কিছু গুলিয়ে যায়। আপনি বোঝাতে পারবেন, হাজার হাজার শ্রমিককে বোঝাচ্ছেন, দিদিকে বোঝাতে পারবেন না? আপনি আজই চলুন, দিদির সঙ্গে ভালো করে আলাপ করিয়ে দিই।"

"কি দরকার? আপনার কাজের ভার আমরা অন্য কাউকে দেবো, কিছু মনে করবো না আমরা, আপনার গুরুজন যা বলেন তাই করুন।"

জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো রূপালী।

তারপর মুখ না ফিরিয়েই বললো, "আপনি শুনলে হাসবেন প্রসাদ বাবু, আমি হয়তো রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলবার জন্যে জন্মেছি, কিন্তু তা'তে আমি রাজী নই। ছেলেবেলা থেকে এই সেদিন পর্যন্ত কোনোদিন শান্তি পাইনি, স্বাধীনতা পাইনি, চোখ খুলে শুধু অভাবের বিভীষিকাই দেখেছি, শুধু দেখেছি যে আমার কাজ মনের পায়ে বেড়ি পরিয়ে ছোটো গণ্ডির মধ্যে মজে থাকা, জীবনকে বাজি ধরে আরেকটি অভাবের সংসারে কোনো এক দুর্ভাগাকে বিয়ে করা, আর কয়েকটি হতভাগার আর হতভাগিনীর মা হওয়া, যারা আমার এই আটপৌরে ঐতিহ্যের জের টেনে নিয়ে যাবে বংশানুক্রমে। কিন্তু আমার মনতো তা'তে সায় দেয়নি। দিনরাত শুধু মনে হয়েছে, এ ধরনের জীবন আর নয়, একটা পরিবর্তন চাই।"

কনডাক্টর এসে টিকিট চাইলো। প্রসাদ টিকিট করলো দুটো।

"সংসারে অভাব ছিলো, আমি কিন্তু অভাবের সংসারে কিছু টাকা আনবার জন্যেই চাকরি করতে যাইনি," রূপালী বলে চললো, "আমি চাকরি করতে গেছি বাড়ির অসহ্য আবহাওয়া এড়ানোর জন্যে।—তারপর একদিন একজনের সঙ্গে দেখা হোলো, তাকে নিয়ে একটু স্বপ্নও দেখলাম, ভাবলাম এই বুঝি পরিবর্তন এলো জীবনে। কিন্তু সে ছেলেমানুষিও কাটিয়ে উঠলাম একদিন, খুব ঘা খেয়ে বুঝে নিলাম যে আমাদের মতো গরীব মধ্যবিত্তের জীবনে ওসব শুধু আকাশ কুসুম।"

বাস চলছিলো খুব জোরে। হু হু করে হাওয়া আসছিলো খোলা জানলা দিয়ে। উড়ে এসে মুখে পড়ছিলো সামনের কয়েকগাছি চুল। সে চুলের মিষ্টি তেলের গন্ধ ভেসে এলো প্রসাদের নাকে।

"তারপর যেদিন আপনাদের মধ্যে এসে পড়লাম, সেদিন আমার মন ভরে উঠলো। আমাদের এত দুঃখ কেন তাও বুঝতে শিখলাম, সে দুঃখ কিসে যাবে তাও জানলাম। বেলেঘাটার বিড়ি ফ্যাক্টরির মেয়ে শ্রমিকদের মধ্যে, কলকাতার অফিসগুলোর মেয়ে কেরানীদের মধ্যে, রেফিউজি কলোনির বৌ-ঝিয়েদের মধ্যে কাজে নেমে যে বৈচিত্র্যের খোঁজ পেলাম, আজ সেসব বাদ দিয়ে কি করে আবার একটি ছোটো সংসারের জেলখানায় বাঁধা পড়তে রাজী হই বলুন তো?"

"আপনি আর বিয়ে থা করবেন না বলছেন?" জিজ্ঞেস করলো প্রসাদ।

"না, সে কথা বলছি না। করবো নিশ্চয়ই একজন কাউকে, আর শুধু তাকেই করবো যাকে বিয়ে করলে আমায় এসব ছেড়ে সরে যেতে না হয়। তা নইলে নয়।"

সারাটি পথ প্রসাদ বা রুপালী আর কোনো কথা বললো না। রুপালীর বাড়ির কাছাকাছি এসে প্রসাদ বললো, "আপনার দিদিকে বোঝানোর ভার আমি নিলাম। আপনি আর ভাববেন না। তবে আজ আর নয়। কাল বিকেলে আসবো আপনাদের বাড়ি।"

"কিন্তু তখন তো আমি থাকবো না—।"

"কিছু অসুবিধে হবে না তাতে? আপনার দিদি আমায় ঠিক চিনতে পারবেন। উনি নিশ্চয়ই আমায় ভুলে যাননি।"

রুপালীর সঙ্গে প্রসাদের দেখা হোতো প্রত্যেকদিনই। কিন্তু ছয় সাত দিন রুপালীও কিছু জিজ্ঞেস করলো না, প্রসাদও কিছু বললো না।

তারপর একদিন প্রসাদ রুপালীকে ডেকে নিয়ে বললো, "আপনার জন্যে শ্যামলীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমায় যে এরকম বিপদে পড়তে হবে কে জানতো?"

রুপালীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলো, "কেন?"

"আপনার দিদির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পর আপনার মা তো আমায় খুব খাতির যত্ন করলেন, চা শিঙাড়া খাওয়ালেন। পর পর তিনদিন গেলাম আপনাদের বাড়ি। তারপর শুনি ইতিমধ্যে একদিন আপনার মা গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ি, আমার দিদির সঙ্গে দেখা করতে।—সংসারে আমার আপন বলতে ওই এক বিধবা দিদি আর আমার ভাগ্নে।—তারপর দিদি এলেন আপনাদের বাড়ি।"

"তাই নাকি? এসব তো আমি জানি না," রুপালী বললে।

"আজ সকালে দিদি বললে, প্রসাদ, তোকে বিয়ে একটা তো এবার করতে হয়। মা বাবা বেঁচে নেই, বিয়েটা আমি ধরে পড়ে না দিলে কে দেবে বল। আমি বল্লাম, তোমার কি মাথা খারাপ হোলো! আমার চাল নেই, চুলো নেই, চাকরি আজ আছে, কাল নেই। দিদি বললে, সে আমি বুঝবো'খন। তারপর কী ঝামেলা! আমি যতো মাথা নাড়ি দিদি ততো চোখের জল ফেলে। শেষ পর্যন্ত বললাম, বেশ, তুমি যদি খুশী হও, তো মেয়ে দেখ। পরে সে মেয়ে উপোস করলে আমি জানি না। দিদি বললে, মেয়ে আমি দেখেছি। সেনেদের বাড়ির শ্যামলী। শুনে আমার চক্ষু স্থির। বল্লাম, আমি একটি ফ্যাক্টরিতে সুপারভাইজার আর শ্যামলী শিক্ষিতা, গ্র্যাজুয়েট। দিদি বল্লে, ওতে কিছু আসে যায় না, ওর মায়ের নাকি আমায় খুব পছন্দ। শ্যামলী রাজী হলেই কথাবার্তা পাকা হবে।"

রুপালী হেসে ফেললো। "ও মা, এত কাণ্ড হয়ে গেল বাড়িতে, আমি কিছুই জানি না?" তারপর মুখ কালো করে বললো, "কিন্তু আমার কি হবে?"

একটু চুপ করে থেকে প্রসাদ উত্তর দিলো, "সে প্ল্যানও হয়ে গেছে। আপনার মা আমায় বলেছেন। আপনি চাকরি করুন, বাইরে কাজ করুন, কিছুতে ওঁর আপত্তি নেই, শুধু আপনাকে বিয়ে করতে হবে। ছেলে উনি ঠিক

করেছেন, এখন শুধু তাকে রাজী করাতে হবে। সে হয়তো আপনার চাকরি করাতে আপত্তি করবে না। আমি বললে নিশ্চয়ই করবে না। ওর বাবা মারা গেছেন কিছুদিন আগে, ওর কোনো অভিভাবক নেই, কোনো অসুবিধে নিশ্চয়ই হবে না। ওকে শ্যামলীও বলবে, আমিও বলবো।"

"সর্বনাশ! ছেলেটি কে?" রুপালী জিজ্ঞেস করলো।

একটু হেসে প্রসাদ বললো, "আমাদের হরিদাস।"

"আবার ওই হরিদাসকে?"

রুপালীর মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

তখন বিকেল পাঁচটা। রান্নাঘরে বসে লুচি ভাজছিলো শ্যামলী।

নীরজা বসে লুচি বেলে দিচ্ছিলেন।

"কই বললি না?" জিজ্ঞেস করলেন নীরজা।

"কি বলবো, মা?"

"শ্যামলী, ছেলেটি সুন্দর, ভদ্র, চাকরি করে, ছোটো সংসার, একমাত্র খুঁত ও গ্র্যাজুয়েট নয়।"

"ও কথা কেন আর বার বার বলছো মা।"

নীরজা বলে চললেন, "অতো দেখতে গেলে কি আর চলে। সব দিক তো পাওয়া যাবে না। উনি তোর বিয়ে দিয়ে যেতে পারলেন না, সে আমার কপাল। কিন্তু তোর একটি ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে না পারলে যে আমিও শান্তিতে মরতে পারবো না। তুই কি তাই চাস?"

শ্যামলী কোনো উত্তর দিলো না। ভেজে চললো নিজের মনে। আলুর দম দিয়ে লুচি খেতে বড়ো ভালোবাসে রুপালী। বেচারী বড়ো রাত করে ফেরে আজকাল, ক্লান্ত হয়ে কথা বলতে পারে না। আজ একটু সকাল করে ফিরবে বলে গেছে।

"তুই কি বিয়ে করবি না?" নীরজার গলা কেঁপে গেল।

শ্যামলী চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে মায়ের চোখ জলে টলটল করছে। তার নিজের চোখও জলে ভরে এলো।

"আমি বিয়ে করলে তুমি সুখী হবে মা?"

নীরজা আচল দিয়ে চোখ মুছলেন।

"বেশ, তোমাদের যেখানে খুশি বিয়ের ঠিক করো, আমার কোনো আপত্তি নেই," শ্যামলী বললো।

•

শ্যামলী উত্তরপাড়ায় ফিরে গেল তার জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে আসবে বলে।

বিকেল বেলা মনে পড়লো যে আজ শনিবার। হরিদাস আসবে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে তার ছোটো মেয়েটিকে নিয়ে। রুপালীর সম্বন্ধে যা স্থির করা হয়েছে, তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। শ্যামলী বেরিয়ে পড়লো।

হরিদাস শুনে বললো, "আপনি এখানকার কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন শুনে আমি খুশী হলাম খুব। সত্যি, নিজের বাড়ির লোকজনকে ছেড়ে এখানে কি করে এদ্দিন ছিলেন সেটাই আশ্চর্য।"

হরিদাসের মেয়েটির সঙ্গে বড্ডো ভাব হয়ে গিয়েছিলো শ্যামলীর। তাকে কোলে বসিয়ে চুলের রিবনটি ঠিক করে দিলো সে।

তারপর বললো, "আরেকটি খবর দেবো আপনাকে?" বলে একটু হাসলো ঈষৎ লজ্জায়।

লাজুক ছেলে হরিদাস কয়েক দিনের আলাপে অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছিলো শ্যামলীর কাছে। ওদের মাঝে মাঝে দেখা হোতো দক্ষিণেশ্বরে, দেখা হলেই একসঙ্গে গঙ্গার পাড়ে বসে গল্প করতো ওরা। হরিদাসের মেয়েটি ছুটোছুটি করে বেড়াতো, তারপর এসে চড়ে বসতো শ্যামলীর কোলে। কতদিন সে তার কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশ একটা সহজ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো হরিদাস আর শ্যামলীর মধ্যে।

হরিদাস বললে, "বলুন কি খবর?"

"আপনার প্রসাদ দা'র সঙ্গে আমার বিয়ে—।"

হরিদাস অবাক হয়ে তাকালো শ্যামলীর দিকে। তারপর বললে, "এটা সত্যি অবাক হওয়ার মতো খবর। কিন্তু খুব খুশী হয়েছি আমি। প্রসাদ দা' বড়ো ভালো ছেলে। খুব ভালো ছিলো পড়াশুনোয়। কিন্তু আই-এস'সি পাস করে আর পড়লো না,—ওদের বাড়িতে তখন খুব অভাব যাচ্ছে—বললে, হাতে কলমে কাজ শিখবো, তাই ঢুকে পড়লো ফ্যাক্টরিতে। ও যা জানে, ওকে কোনোদিন বসে খেতে হবে না। শ্রমিক আন্দোলনের মস্তো কর্মী সে। ওকে বড়ো ভালোবাসে সবাই। প্রসাদ দা'র পছন্দ যে এত ভালো আমি ভাবতে পারিনি। আপনাকে বাইরে থেকে যতটা ভালো মনে হয়, আপনি যে তার চেয়ে অনেক বেশী ভালো। ওকে সামলাতে হলে আপনার মতো একটি দিদি টাইপএর মেয়েরই দরকার। ও বড্ড এলোমেলো। আপনি ওকে সামলাতে পারবেন।"

এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে হরিদাসের হঠাৎ মনে হোলো যে বড্ডো বেশী কথা বলা হয়ে গেছে। লজ্জা পেলো সে। দু'একটা ঢোক গিলে বললো, "মাপ করবেন, হঠাৎ কতকগুলো অবান্তর কথা বলে ফেললাম। রাগ করলেন না তো?"

হাসলো শ্যামলী। "না ভাই, রাগ করিনি।" তারপর বললো, "আচ্ছা, হরিদাস বাবু, আপনি আর বিয়ে করবেন না?"

হরিদাস একটু চুপ করে থেকে বললো, "বিয়ের কথা আমি আর ভাবছি না। কি আমার দাম বলুন? একবার একটি মেয়ের কাছে অনেকগুলি অপ্রিয় সত্য শুনেছিলাম। তারপর থেকে আর ভরসা পাইনে।"

শ্যামলী হাসি মুখে বললো, "আচ্ছা, সে মেয়েটির সঙ্গেই যদি আমি আপনার বিয়ে দিই—?"

"রূপালীর কথা বলছেন?"

"তবে আর কার কথা বলবো?"

হরিদাস ঘাড় নাড়লো ডাইনে থেকে বাঁয়ে।

শ্যামলী বললে, "বেশ, রুপালীর চেনা একটি মেয়ে আছে, তার নাম সুমিত্রা। আপনাদের প্রবাল বাবুও চেনেন তাকে। তার সঙ্গে সম্বন্ধ করি—?"

হরিদাস আবার ঘাড় নাড়লো, "না, আমি অন্য কোনো মেয়েকে, মানে কোনো মেয়েকেই আমি বিয়ে করতে পারবো না, মানে আমি—আমি আর বিয়েই করবো না।"

শ্যামলী হাসলো। বেচারা!

তারপর বললো, "আমার একটি কথা রাখবেন হরিদাস বাবু?"

"বলুন।"

"কাল খেতে আসুন আমাদের বাড়ি। নেমন্তন্ন রইলো আপনার। আপনার প্রসাদ দা'কেও বলা হবে। মায়ের সঙ্গে কথা পাকাপাকি হয়ে যাক।"

হরিদাস তাকিয়ে দেখলো তার মেয়েটি অন্যদিনের মতো আজও শ্যামলীর কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আস্তে আস্তে বললো, "আজ সকালে প্রসাদ দা' এসেছিলেন। বেশীক্ষণ বসতে পারেননি। চারদিকে নাকি অনেক কাজ। শুধু বললে, আমি বিয়ে করছি। কে, কোথায়, কবে, পরে বলবো। আর বললে, সেই রুপালী মেয়েটির সঙ্গে তোর বিয়ের ঠিক করছি। কাল সকালে একবার আসবো। কি মত দিবি, ভেবে ঠিক করে রাখ। পণ চাইবি তো মেরে হাড় ভেঙে দেবো। এক পয়সাও পাবিনে। আর মত যদি না দিস তো মাথা ভেঙে ফেলবো,—এই বলে চলে গেল।"

শ্যামলীর হাসি পেলো। কিছু বললো না।

"আমি রুপালীকে বিয়ে করি এই কি আপনারা সবাই চান?"

"নিশ্চয়ই," বললো শ্যামলী, "আপনার সঙ্গে আমার এত চেনাশোনা,

আপনাকে বেঁধে রাখতে না পারলে মন মানছে না," বলে শ্যামলা হাসলো।

"আমায় বেঁধে রাখতে চান?"—হরিদাস কি রকম যেন একটা ম্লান হাসি হাসলো।

তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "আমি রুপালীকে বিয়ে করি আপনিও কি তাই চান?

শ্যামলী হাসি চেপে ঘাড় নাড়লো।

হরিদাস উত্তর দিলো, "বেশ কাল আসবো।"

অনেক চোখের জল ফেলে শেষ পর্যন্ত হরিদাসকে বিয়ে করতে রাজী হোলো রুপালী।

"তোমরা যদি তাই চাও," সে বললে, "আমার কিছু বলবার নেই।"

প্রসাদও যখন বললো কোনো আপত্তিই করলো না রুপালী। সে যে চাকরি করে যেতে পারবে, আর শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গেও সংযোগ রাখতে পারবে সেই আশ্বাস পাওয়ার পর রুপালী আর কোনো কথা বললো না।

স্থির হোলো স্ট্রাইকের গণ্ডগোলটা মিটে যাওয়ার পর বিয়ের দিন ঠিক হবে।

প্রসাদ ভীষণ ব্যস্ত। রুপালীও।

স্ট্রাইকের নোটিস দেওয়া হবে শিগ্‌গিরই।

॥ নয় ॥

ডলি দেশরাজের কাছে রজত শুনলো ওদের ডিরেক্টার ওর কাছে রজতের কথা শুনে রজতকে নিয়ে যেতে বলেছে।

তারপরদিন সাজ গোজ করে গলায় টাই এঁটে রজত ডিরেক্টারের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ডিরেক্টার শেঠ কিশোরীলাল জাতে নিরামিষাশী মধ্য-ভারতীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ ভাব ভঙ্গীতে আধুনিকতম আমেরিকান। অল্প কথার মানুষ।

বললে, "দেখ, তোমার চাকরি রেডি। আমাদের লেবার ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টে একটি পোস্ট খালি হয়েছে। মিস দেশরাজের কাছে তোমার কথা শুনলাম। পাঞ্জাবী মেয়েরা সাধারণত বাঙালী ছেলের সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করে না। সুতরাং সে যখন তোমার জন্যে এত করে বলছে তখন মনে হোলো তুমি নিশ্চয়ই খুব স্মার্ট। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তোমায় দিয়ে কাজ চলতে পারে, তবে জেনে রাখো যে আমি স্যুটের কাট দেখে আর মুখের কথা শুনে কোনো মতামত গঠন করি না। আমি দেখি কাজ। খুব খাটতে হবে। পারবে?"

"আপনি যদি সুযোগ দেন তো নিশ্চয়ই পারবো," রজত বিনীত হাসি হেসে বললো।

"বেশ, আমি চান্স দিচ্ছি।" ডিরেক্টার সায়েব ঠোঁট থেকে চুরুট নামিয়ে বললো, "তবে আপাতত ছ'মাস। এটা প্রোবেশান। তোমার তো কোনো লেবার ওয়েলফেয়ার ডিপ্লোমা নেই। তাতে উপস্থিত কিছু যায় আসে না। অফিসে স্ট্রাইক হওয়ার তোড় জোড় চলছে। এটা হতে না দেওয়াই তোমার প্রথম কাজ। আমরা পলিসি ঠিক করে দেবো,

তোমার সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যদি ভালো কাজ দেখাতে পারো তোমায় ইউনিভার্সিটিতে ওয়েলফেয়ার কোর্স টা করবার বন্দোবস্ত করে দেবো। মনে রেখো এ চাকরির অনেক প্রসপেক্টস্—তবে সব কিছু তোমার নিজের দক্ষতার উপর নির্ভর করবে। কবে থেকে কাজে যোগ দিতে পারবে?"

"আপনি যদি বলেন তো, এক্ষুণি।"

ডিরেক্টার একটু হাসলো। বললো, "অল রাইট। কাল থেকে যোগ দাও—।"

রজত বুঝলো ইণ্টারভিউ শেষ হয়েছে। সে উঠে দাঁড়ালো।

এমন সময় দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো মোহিত চ্যাটার্জি।

রজতকে চিনবে কি চিনবে না ভাবলো এক মুহূর্ত। ডিরেক্টারের অতি প্রসন্ন হাসি হাসি মুখ দেখে স্থির করলো যে চিনতে পারলে কোনো ক্ষতি নেই।

তারপর অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হওয়ার বিস্ময় মুখে ফুটিয়ে মোহিত চ্যাটার্জি বললো, "আরে রজত, তুমি?"

"চেনেন নাকি ওকে?" ডিরেক্টার জিজ্ঞেস করলো। "ও আমাদের এখানে যোগ দিচ্ছে এসিস্ট্যাণ্ট লেবার অফিসার হয়ে।"

"তাই নাকি। খুব খুশী হলাম শুনে। ইন ফ্যাক্ট এ আমার ব্রাদার-ইন্-ল'।"

"ইজ ছাট সো? আগে তো বলেননি?"

"ওয়েল, আপনি তো জানেন, আমি চাই সবাই যে যার নিজের মেরিটে কেরিয়ার তৈরি করুক। আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে চাকরি যোগাড় করা, এসব আমি খুব এনকারেজ্ করি না। যাই হোক, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্, আপনি যে ওর মধ্যে মেরিট দেখতে পেয়েছেন, আমি খুব খুশী হলাম তাতে। আমি বলিনি রজত, সব সময় যা করবে নিজের চেষ্টায় করবে, একে ওকে তাকে ধরে কিছু করবে না, তাতে কিছু করা যায় না। এবার দেখলে তো? নাও দি ফিউচার লাইস্ ওপেন বিফোর ইউ। এগিয়ে যাও,

এগিয়ে যাও। বাক্ আপ্। আচ্ছা, এখন এসো রজত। এঁর সঙ্গে আমার একটু জরুরী কাজ আছে। কাল পরশু একদিন এসে তোমার দিদিকে খবরটা দিয়ে যেও। ও তো দিনরাত তোমার ভাবনা ভেবে ভেবে রোগা হয়ে গেল।"

"ইনি কি মিসেস্ চ্যাটার্জির আপন ভাই?" জিজ্ঞেস করলো শেঠ কিশোরীলাল।

"আপন ভাই, সব চেয়ে বিলাভেড্ ভাই। তবে একটা কথা, অফিসে কাউকে বলবেন না।"

"ওয়েল, কারো জানবার তো দরকার নেই। এনিওয়ে, কাল এসো। নাইন থার্টি শার্প।"

ও চলে যেতে ডিরেক্টার বললো, "কোয়াইট এ স্মার্ট ফেলো।"

"ও, ভেরি—," পাইপটি ধরিয়ে নিয়ে উত্তর দিলো মোহিত চ্যাটার্জি।

বাইরে বেরুতেই দেখে ডলি দাঁড়িয়ে আছে। খুব হাসি হাসি মুখ।

"আমি জানি তোমার চাকরি হয়ে গেছে," ডলি বললো। "চলো বেরুই।"

"তোমার কাজ নেই?"

"আজ ছুটি নিয়েছি শরীর খারাপ লাগছে, এই বলে। তুমি চাকরি পেলে, বাইরে গিয়ে তোমার সঙ্গে হৈ হৈ না করে অফিসে বসে কাজ করবো আমি?"

ডলির সঙ্গে রজত বেরিয়ে এলো। একটা ভয় ছিলো যদি রুপালীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এখুনি জানতে দেওয়া নিস্প্রয়োজন।

কিন্তু দেখা হোলো না। অফিসটি অন্য পাশে। কেরানী এসিস্ট্যান্টেরা যাওয়া আসা করে অন্য পথ দিয়ে। এ পথটি বাইরের ভিজিটারদের জন্যে, যাঁরা ডিরেক্টারদের সঙ্গে দেখা করতে আসে।

ডলিকে নিয়ে সোজা চলে এলো চৌরঙ্গীতে।

রাস্তায় প্রবালের সঙ্গে দেখা।

প্রবালকে দেখে রজত দাঁড়িয়ে পড়লো। ডেকে বললো:

"প্রবাল দা', একটি খুব ভালো খবর আছে—।"

"কি ব্যাপার," জিজ্ঞেস করলো প্রবাল।

রজত ইণ্টারভিউর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে চাকরি পাওয়ার খবরটা দিলো।

"কাল থেকে জয়ন্ করছি।"

প্রবাল শুনে খুব খুশী হোলো।

"কোথায় যাচ্ছেন প্রবাল দা'। খুব জরুরী কাজ না হলে বাদ দিন। আজ ডলি খাওয়াচ্ছে আমায়। অবশ্যি সব সময় ডলিই খাওয়ায়।"

"তোমার কী সৌভাগ্য," প্রবাল হাসি মুখে বললো, "আমরা তো শুধু খাইয়েই ফতুর হই।—যাক, আজ ডলি খাওয়াচ্ছে না, আজ খাওয়াচ্ছি আমি।"

রজতের আপত্তি নেই। একজন কেউ খাওয়ালেই হোলো।

"আরে, ডলির সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়নি," রজত বললে, "ডলি, ইনি আমার প্রবাল দা, এঁর কথা তোমায় বলেছি। আর এ হোলো ডলি দেশরাজ, এর কথাও আপনাকে বলেছি প্রবাল দা'...।"

রজত আর ডলিকে নিয়ে প্রবালের একটি চমৎকার সন্ধ্যা কাটলো। এমন মিষ্টি মেয়ে ডলি—অবশ্যি তার প্রাক-দেশবিভাগ দিনগুলোর সম্বন্ধে বোলচালগুলো বাদ দিয়ে। ডলির সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব জমে গেল প্রবালের।

রাত্তিরে বাড়ি ফিরে মোহিত বললো দীপালীকে, "তোমার ভায়ের চাকরি করে দিলাম দীপু।"

"সত্যি?" খুব খুশী দীপালী।

"কী চাকরি," নিস্পৃহ ভাবে জিজ্ঞেস করলো ক্ষমা।

\
"এসিস্ট্যাণ্ট লেবার অফিসার। পানামা কোল্ড স্টোরেজ এ্যাণ্ড রেফ্রিজারেটার্স এ—।"

"তাই নাকি ?" কিঞ্চিৎ আগ্রহ অনুভূত হোলো ক্ষমার কণ্ঠস্বরে।

"অবশ্যি ঠিক আমি যোগাড় করে দিয়েছি বলা অনুচিত হবে," মোহিত বললো। "আমার কথামতো ও গিয়ে দেখা করলো কিশোরীলালের সঙ্গে, তারপর আমিও বলে দিলাম। আমি না বললেও হোতো, ও কিশোরীলালকে খুব ইম্প্রেস্ করেছে। যাক, আমার মুখ রইলো।"

"তা'হলে ভাই বোন দুজনে একই অফিসে কাজ পেলো। রুপালীর কি খবর ?" জিজ্ঞেস করলে দীপালী।

মোহিত এবার একটু গাম্ভীর্য অবলম্বন করলো।

"ওর খবর, কি আর বলবো। চাকরি পেলেই এদের এমন মাথা গরম হয়। রুপালী অফিসের স্ট্রাইকের ব্যাপারে একজন মস্তো পাণ্ডা। তাছাড়া বাইরেও ট্রেড ইউনিয়ান ইত্যাদি কি সব করছে। ভাগ্যিস্ কেউ জানে না ও আমার শালী। মাথা কাটা যেতো তা'হলে।"

"দেখা হয় ওর সঙ্গে ?"

একটু চুপ করে থেকে মোহিত উত্তর দিলো, "কচিৎ কদাচিত। তবে সেও কথা বলে না, আমিও বলি না। মেয়েটির এ ভদ্রতাটুকু আছে।"

মোহিত উপরে উঠে গেল।

দীপালী দাঁড়িয়ে রইলো চুপটি করে।

রজতের কথা ভেবে খুশী হতে গিয়ে খুশী হওয়া গেল না রুপালীর কথা মনে পড়ায়।

কদ্দিন তাকে দেখেনি দীপালী—!

॥ দশ ॥

দিন তিন চার পর একদিন বিকেলবেলা শ্যামলী বাড়ি ফিরে দেখে তুমুল ঝগড়া বেধে গেছে রজত আর রুপালীর মধ্যে।

রুপালী বলছিলো, "তোমার কাছ থেকে এরকম বেইমানি আশা করিনি দাদা। আমাকে তুমি বোন বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করো, এর চেয়ে জঘন্য মনোবৃত্তি আর কি হতে পারে?"

"কি হয়েছেরে রুপু?" শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো।

রুপালী শ্যামলীর প্রশ্নের উত্তর দিলো না।

বলে চললো, "কিন্তু তোমায় দাদা বলে তো অস্বীকার করতে পারবো না, সেই পরিচয় দেবোও, তবে তুমি আমার ভাই বলে যে আমি আর কোনোদিন গর্ব বোধ করবো না, সেটা জেনে রেখো।"

রজত বললে, "সামান্য তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তোরা কেন যে তিলকে তাল করিস আমি ভেবে পাইনে।"

"তুচ্ছ ব্যাপার? ডিরেক্টারের পি-এ' সেই পাঞ্জাবী মেয়েটির সঙ্গে ওর কামরা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় তুমি ওকে জিজ্ঞেস করোনি যে এ মেয়েটিই বুঝি রুপালী সেন?"

"ওকে জানতে দিতে চাইনি," রজত উত্তর দিলো, "তাতে উপস্থিত আমার কাজের অসুবিধে হোতো।"

"হ'লে হোতো," ফেটে পড়লো রুপালী, "কাজের কোনো রকম সুবিধে করতে না পেরে এদ্দিন কেটেছে, না হয় আরো কিছুদিন কাটতো। তাই বলে নিজের বোনকে তুমি বোন বলে চিনবে না?"

"ও সব কিছু নয়—।"

"কিছু নয়? তোমার মতো ধাপ্পাবাজ, তোমার মতো দুর্বল-চরিত্র মেরু-

দণ্ডহীন আত্মসম্মানজ্ঞানহীন লোকের কাছে এমন কিছু না হতে পারে, কিন্তু……”

“কাকে কি বলছিস রুপু,” শ্যামলী বাধা দিয়ে বললো।

“তুমি চুপ করো ছোড়দি, যা জানো না তা নিয়ে ফোড়ন দিতে এসো না।” তারপর রজতের দিকে ফিরে বললো, “ডলি দেশরাজের মতো একটি চীপ্ আপস্টার্ট মেয়ের সঙ্গে তোমার এদ্দিন ধরে ঢলাঢলি ওসব কি আমার জানতে বাকি আছে মনে করেছো? বাড়িতে চালের টাকা জোটে না, আর ওদিকে তুমি ছোড়দির কাছ থেকে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে এপ্লিকেশান করবে বলে টাকা ডলির পিছনে ওড়াওনি? সব খবরই আমরা রাখি। ওকে নাকি তুমি ভালোবাসো, কিন্তু ওকে মিছে কথা বলতেও তোমার বাধেনি। ওকে তুমি বলোনি যে তুমি আগে কলেজের প্রফেসার ছিলে?”

শ্যামলী আস্তে আস্তে বললো, “বাড়িতে দিনরাত ঝগড়া আর গণ্ডগোল। এর কি শেষ হবে না কোনোদিন?”

“আমার অপরাধ,” রজত বললে, “আমি চাকরি পেয়েছি ওদের ফার্মে। এসিস্ট্যান্ট লেবার অফিসারের চাকরি। সুতরাং রুপালীকে আমার বোন বলে পরিচয় না দিয়ে কি অপরাধ করেছি শুনি? ওতো এমপ্লয়িজ্ ইউনিয়ানের একজন কমিটি মেম্বার, স্ট্রাইক কমিটিতেও আছে। ওর যা সুনাম, ওরা জানলে আমায় চাকরি দিতো?”

কেউ কোনো উত্তর দিলো না।

সবার নীরবতা রজতের ভালো লাগলো না।

সে এর ওর মুখের দিকে তাকালো। তারপর বললো, “কিন্তু আমার চাকরি না নিয়ে উপায় কি বলো? ডলিকে বিয়ে করলে ওকে খাওয়ানোর সংস্থান চাই তো! আর আমি যে ডলিকে বিয়ে করছি, সেটি আমার আরেকটি অপরাধ। অপরাধ, কারণ ও মুখে গালে রং মাখে, ভালো জামাকাপড় পরে, ডিরেক্টারের প্রিয়পাত্রী, অফিসের এসব ঝামেলার

মধ্যে থাকে না। রুপালীদের সঙ্গে তার বনে না, সুতরাং তার সঙ্গে আমার মেলামেশাও অন্যায়, এই তো?"

রুপালী কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না। মুখ ফিরিয়ে রইলো।

রজত বলে চললো, "ছোড়দি, তোমার থেকে টাকা যা নিয়েছি, সব তো ধার। আমি কি কোনোদিন বলেছি, ও টাকা আমি ফিরিয়ে দেবো না? তুমি আমায় ও টাকা দিয়েছো চাকরির এপ্লিকেশান করতে। সে টাকা আমি পাব্লিক সার্ভিস কমিশনকে দিয়ে চাকরি জোটাই কি পাঞ্জাবী মেয়েকে আইসক্রীম খাইয়ে চাকরি জোটাই, তোমাদের তাতে কি? তোমরা বোধ হয় জানো না চাকরিটা আমায় ডলিই পাইয়ে দিয়েছে।"

"জানো ছোড়দি," রুপালী বলে উঠলো, "দাদা আমার মতো গরীব কেরানীকে বোন বলে পরিচয় দেয়নি, কিন্তু নিজেকে জামাইবাবুর শালা বলে পরিচয় দিয়েছে বুক ফুলিয়ে। কেন? লজ্জা করে না তোমার? বড়দি বিয়ের পর মা-বাবার কোন খোঁজ খবর নেয়নি কোনোদিন। জামাই বাবু সে যতো বড়ো লোকই হোক, আমাদের কাছে পর, আমাদের কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যক্তি।"

"বড়দির সঙ্গে দেখা হ'লে বড়দি আমায় কি রকম আদর যত্ন করে তাতো জানিস না। জামাইবাবু কী খুশী হয় আমায় দেখে," রজত বললে।

"ওখানে যান বুঝি?" শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, এমনি, এই—মাঝে মাঝে—কখনও—," বলতে বলতে থেমে গেল রজত।

"তোমায় দেখে তো খুশী হবেই," রুপালী বললো, "তুমি তো এখন অফিসার। আমাদের মতো গরীবের সঙ্গে তোমার কি পোষায়? তুমি তাই ওদের মতো বড়োলোকের সমাজে ভিড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছো।"

"খুব অন্যায় কাজ করেছিস রজত," শ্যামলী আস্তে আস্তে বললো।

রজত চুপ করে গেল। রুপালীও আর কিছু বললো না।

হঠাৎ নিসাড় নিস্তব্ধ হয়ে গেল ঘরখানি। শ্যামলীর কথাগুলো দেওয়ালের গায়ে গায়ে ধাক্কা মেরে ফিরে এলো।

অনেকক্ষণ পর রজত মুখ ফিরিয়ে বললো, "কেরিয়ারের জন্যে অনেক কিছু করতে হয় ছোড়দি। অনেক সয়েছি, আর পারছি না।"

"কি কেরিয়ার তুই করছিস জানি না," উত্তর দিলো শ্যামলী, "কিন্তু এটুকু জেনে রাখ, যে কেরিয়ার তোকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেবে, তার জন্যে তুই কোনো মর্যাদা পাবি না আমাদের কাছে।"

রজত আর কোনো কথা বললো না। জামাকাপড় বদলে বেরিয়ে গেল।

রজত সোজা চলে এলো রেইনি পার্কে মোহিত চ্যাটার্জির বাড়ি।

তাকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানালো তার ভগ্নীপতি—।

"এসো, এসো, এসো, এসো, এসো—। এদ্দিন দেখা নেই কেন? আজ কদিন ধরে আশা করছি তুমি আসবে।"

এরা আমায় কী ভীষণ ভালোবাসে, রজত ভাবলো।

"তুই এমন দিনে এলি যখন আমাদের একটু বেরুতে হবে," বললে দীপালী। "মিসেস্ বোসের বাড়ি চায়ের নেমন্তন্ন।" মোহিতের দিকে ফিরে বললো, "বরং ক্ষমাকে নিয়ে তুমিই যাও। আমি রজতের সঙ্গে বসে গল্প করি।"

"সে কি করে হয়," মোহিত উত্তর দিলো, "চলো তুমি আর আমি চট করে ঘুরে আসি। রজত ততোক্ষণ ক্ষমার সঙ্গে বসে গল্প করুক।"

রজত এতক্ষণে লক্ষ্য করলো যে ক্ষমা তাকে দেখে উঠে চলে যায়নি অন্যান্যবারের মতো।

"আমিই বরং উঠি আজ। কাল কিংবা পরশু আসবো," রজত বললো।"

"পাগল না মাথা খারাপ," মোহিত রজতের কাঁধে চাপ দিয়ে ওকে বসিয়ে দিলো, "তুমি আজ এখানে খেয়ে যাবে।"

ওরা বেরিয়ে গেল।

রজত বসে বসে গল্প করলো ক্ষমার সঙ্গে।

বেশ স্মার্ট মেয়েটি !—রজতের মনে হোলো।

রাত্তিরেও খাওয়াদাওয়ার পর রুপালী বোঝাচ্ছিলো শ্যামলীকে।

রজত তখনো ফেরেনি।

"বুঝলে ছোড়দি, এতবড় বেইমান দাদাটা! ডলির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সে চিনে নিচ্ছিলো স্ট্রাইকের পাণ্ডাদের। আমি তো ওকে দেখে অবাক। ও কিন্তু আমায় চিনতে চায়নি। গম্ভীর ভাবে ডলিকে জিজ্ঞেস করলো, এ মেয়েটিই বুঝি রুপালী সেন?"

শ্যামলী চুপ করে রইলো।

"জানো ছোড়দি, ওরা আমাদের স্ট্রাইকের আয়োজন বানচাল করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ওদের প্ল্যান সব কার্যকরী করা হবে দাদার হাত দিয়ে। ইস্, শেষ পর্যন্ত আমারই ভাই হোলো গিয়ে কিনা মালিকের দালাল, আমাদের আন্দোলনের শত্রু। অফিসের অন্যান্য সবাই যখন জানবে, ওদের কাছে মুখ দেখাবো কি করে বলো তো।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই রুপালী ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু শ্যামলীর চোখে ঘুম এলো না। দিদির মতো মনখানি তার দীর্ঘ-নিশ্বাসের মৃদু হাওয়ায় তখন দুলছে জানলার পর্দার মতো।

ভালো চাকরি পেলো রজত।

চাকরি পেয়ে সে একটি সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করছে—।

কিন্তু বাড়ির কারো মনে আনন্দ নেই এতে।—

কেন আজকালকার দিনগুলো এরকম হয়ে গেছে,…শ্যামলী ভাবতে লাগলো।

শ্যামলীর চোখে যখন ঘুম নামলো, তখন ও বাড়ির ছাতের ওপারে একটি ক্লান্ত চাঁদ নেতিয়ে পড়েছে। আকাশে একরাশ তারা ছড়ানো। তাদের চোখও ঘুমে পিট পিট করছে।

॥ এগারো ॥

স্ট্রাইক নোটিসের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল।

স্ট্রাইক শুরু হোলো।

তিনদিন পর স্ট্রাইক ভেঙে গেল।

সন্ধ্যেবেলা প্রবাল বসে গল্প করছিলো অফিস-ফেরত সুমিতার সঙ্গে।

"আমাদের নতুন এ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার অফিসার রজত সেন," সুমিতা বললো, "অল্প বয়েস হলে কী হবে, বেশ কাজের লোক। স্ট্রাইক ভেঙে যাওয়ায় তারই হাত আছে।"

সুমিতার কাছে সে-ইতিহাস শুনলো প্রবাল।

নানাজাতের লোক কাজ করে অফিসে আর কারখানায়। মুসলমানদের বোঝানো হোলো হিন্দুদের বিরুদ্ধে, অবাঙালীদের বোঝানো হোলো বাঙালীদের বিরুদ্ধে।

মুসলমানেরা ভাবলো, তাইতো, ওরা সব হিন্দু, পূজোর বোনাস ওরাই পায়, আমরা তো পাই না। ওরা ধর্মঘট করুক, যা খুশি করুক, ওদের জন্যে আমরা কেন স্ট্রাইক করে চাকরি খোয়াই। এই হিন্দুস্থানে আর কে চাকরি দেবে আমাদের!

অবাঙালীরা ভাবলো, তাদের অবাঙালী মালিকের বিরুদ্ধে এসব বাঙালীর প্রাদেশিকতা, আমরা চাকরি খোয়ালে নতুন বাঙালী আসবে আমাদের জায়গায়। কি দরকার ঝামেলা করে। বরং যদি বাঙালীর চাকরি যায় তো মনিবেরা আর বাঙালী নেবে না, তাদের দেশওয়ালীদের বাহাল করবে খালি জায়গাগুলোতে।

বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যারা কংগ্রেসি তাদের সঙ্গে গোলমাল বাধলো কম্যুনিস্টদের সঙ্গে। কংগ্রেসিরা বললে, ধর্মঘট কমিটিতে কম্যুনিস্ট থাকলে আমরা স্ট্রাইক চাই না। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ধর্মঘট আমরা করবো না।

কমুনিস্টেরা বললে, কমিটি থেকে বার করে দাও এসব বেইমানদের, সব মালিকদের দালাল, ঘুষ খেয়ে এখন উল্টো স্বর গাইছে।

তর্কাতর্কি হোলো, হাতাহাতি হোলো, কয়েকটি চেয়ার ভাঙলো, শ্রমিক বস্তিতে সোডার বোতল উড়লো, পুলিশ এলো, কয়েকজন গ্রেপ্তার হোলো —আর ভেঙে গেল ধর্মঘট।

মালিকেরা বদান্যতা দেখালো,—বোনাস পাবে না, তবে একমাসের মাইনে এডভান্স পাবে।

"এসব তো পুরোনো গল্পের পুনরাবৃত্তি," প্রবাল বললো। "নতুন কোন খবর আছে?"

"নতুন খবর? হ্যাঁ, আছে। লেবার অফিসার রজত সেন, সে নাকি আমাদের ডিরেক্টার মোহিত চ্যাটার্জির শালা। শুনছিলাম চ্যাটার্জি সায়েব নাকি ওঁর বোন ক্ষমার সঙ্গে রজতের বিয়ে দেওয়ার মতলবে আছেন।"

"তাই নাকি?" প্রবাল অবাক হোলো।

"হ্যাঁ। অফিসে জোর গুজব। ক্ষমাকে তুমি চেনো না? সেই যে লরেটোয় পড়তো, ভয়ানক নাক উঁচু মেয়েটি?"

"দেখেছি দু'একবার," প্রবাল উত্তর দিলো।

"রজতের দিদি, মিসেস দীপা চ্যাটার্জি, অদ্ভুত একমপ্লিশ্‌ড্‌ মহিলা। খুব পপুলার। ঈভস উইকলির এমন ইশু্য নেই যে ওঁর ছবি বেরোয় না। একবার সামনের কাভারেও মস্তো বড়ো ছবি বেরিয়েছে। ঈশ, ওরকম সুন্দর

চেহারা যদি আমার থাকতো! শুনেছি মোহিত চ্যাটার্জি নাকি পাঁক থেকে পদ্মফুল তুলে এনেছিলেন। দীপালী চ্যাটার্জির বাবা নাকি কোন এক মার্চেণ্ট অফিসের সামান্য কেরানী। একেবারে সত্যিকারের জীবনের সিণ্ডারেলার গল্প।

প্রবাল হাসলো। "রজত যে মোহিত চ্যাটার্জির শালা সে পরিচয়টা জানো। ওর আরেকটি পরিচয় আছে, শুনবে?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"কি?"

"ও রুপালীর দাদা।"

"তাই নাকি? তার মানে রুপালী দীপালীর বোন?"

"হ্যাঁ।"

"আপন বোন?"

"হ্যাঁ—।"

"আশ্চর্য ব্যাপার! রুপালী তো আমায় বলেনি কোনোদিন!"

"থাক ওসব কথা," প্রবাল বললো, "স্ট্রাইক লীডারদের খবর কি?"

একটু ম্লান হেসে সুমিতা বললো, "ভালো নয়। প্রসাদের চাকরি গেছে। রুপালীর চাকরিও গেছে। বেচারী! আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম ওর চাকরিটা রাখতে, কিন্তু হোলো না। বল্লাম, একটি মার্জনা-পত্র দিয়ে দাও, কি হয়েছে তা'তে, কেউ জানবে না। শুনলোই না মেয়েটি। এমন হেড-স্ট্রং! কি আর করি! নোটিস পিরিয়াডের মাইনে দিয়ে ছাড়িয়ে দিতে হোলো। ডিরেক্টারদের হুকুম। আর ভালো লাগে না এই জীবন। এত অপ্রীতিকর কাজ! নিতান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। চলো, সিনেমায় যাই। ভালো বই হচ্ছে নিউ এম্পায়ারে।—"

প্রাসাদ আর রুপালী দাঁড়িয়ে ছিলো এসপ্লানেডে।

ডেলহাউসি স্কোয়ার থেকে আসা ট্রামগুলো তখন অফিস ফেরত যাত্রীতে

ঠাসাঠাসি। ট্রাম ছেড়ে দিতে হোলো একটার পর একটা। কোনোটাতেই ওঠা গেল না। এত ভিড়!

রূপালী ট্রামের ভিড় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো।

"কি দেখছো?" প্রসাদ জিজ্ঞেস করলো, "ওদের মধ্যে নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছো বুঝি। ওখানে আর আমাদের কেউ খুঁজে পাবে না। আমরা এখানে।"

রূপালী হাসলো।

"চলো, কোথাও বসে এক কাপ চা খেয়ে নেওয়া যাক," প্রসাদ বললো।

শ্যামলীর সঙ্গে বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে যাওয়ার পর প্রসাদ রূপালীকে তুমি করেই বলতো।

বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে একটি ছোটো চায়ের দোকানে ঢুকলো ওরা দুজনে। চুপচাপ চা খেলো।

অনেকক্ষণ পর রূপালী জিজ্ঞেস করলো, "প্রসাদ দা'! এর পর?"

"আমাদের কি আর কাজের শেষ আছে?" প্রসাদ উত্তর দিলো।

রূপালী হাসি মুখে তাকালো প্রসাদের দিকে।

প্রসাদ বললো, "কাল একবার দিদিকে পাঠাবো তোমার মায়ের কাছে।"

"কেন?"

"বিয়ে ভেঙে দিতে। আমি এখন বেকার, আর এই বেকারত্ব খুব শিগ্‌গির ঘুচবে বলে মনে হচ্ছে না, সুতরাং কী দরকার মিছেমিছি একটি ভালো মেয়ের জীবনকে আমার অভাব অনটনের সঙ্গে জড়িয়ে—।"

মুখটা ফিরিয়ে নিলো রূপালী। আস্তে আস্তে বললো, "তাই বলে বিয়ে ভেঙে দেবেন কেন? না হয় দু'দিন পরে হবে—।"

"সে আর হয় না," প্রসাদ উত্তর দিলো, "ভেবে দেখলাম, আমাদের

জীবন আরো কয়েক বছর এভাবেই কাটবে—চাকরি আর ছাঁটাই, নতুন চাকরি, আবার ছাঁটাই। নিজের দুঃখের ভাগ আর অন্যকে না দেওয়াই ভালো।"

রুপালী কি রকম যেন একটু আনমনা হয়ে গেল । কলকাতার সেপ্টেম্বর-গোধূলির মতো মনে হোলো তার মুখখানি,—একটু বিষণ্ণ, তবু মুখে হাসি টল টল করছে, সোনালী রং, কিন্তু একটু ম্লান।

কিছুক্ষণ পর মুখ ফিরিয়ে রুপালী বললো, "চলুন, উঠি।"

বাইরের বারান্দায় বসে তখন গল্প করছিলো মোহিত আর দীপালী।

রাস্তার গাছে গাছে পাখিদের কলরব। ওরা বাসায় ফিরে এসেছে। সন্ধ্যা নামছে কলকাতায়।

"দীপু, ব্যাপারটা তো খুব ভালো ঠেকছে না," মোহিত চ্যাটার্জি বললো।

"কি ব্যাপার?"

"অনেকেই বলাবলি করছে ক্ষমার সম্বন্ধে রজতের খুব আগ্রহ। আমি অবশ্যি বিশ্বাস করি না এসব কথা। রজত অত্যন্ত ভালো ছেলে। তা' ছাড়া ও যে সেই পাঞ্জাবী মেয়েটিকে বিয়ে করবে সে তো প্রায় ঠিক হয়েই আছে।"

"সে কি!" দীপালী বললে, "সত্যি সত্যি? আমি ভেবেছিলাম এসব দু'দিনের খেয়াল। কিন্তু যদি সত্যিই ওরা………"

"তা' হলে আমারই মাথা কাটা যাবে দীপু। লোকে বলবে মোহিত চ্যাটার্জির শালা বিয়ে করেছে এক পাঞ্জাবী রেফ্যুজি মেয়েকে।"

"কিন্তু রজত যদি বিয়ে করতে চায় ওকে, তাকে কি ঠেকানো যাবে?" দীপালী জিজ্ঞেস করলো।

"দেখি কি করা যায়," মোহিত উত্তর দিলো, "জীবনে বহু অসাধ্য সাধন করলাম, এটুকু করতে পারবো না?"

একটু চুপ করে থেকে দীপালী বললো, "আমি কি ভাবছিলাম জানো? ক্ষমার সঙ্গে রজতের বিয়ে দিলে মন্দ হয় না।"

মোহিত হাসলো। "আমার মাথায়ও সে কথা যে আসেনি, তা নয়। তবে এখন থাক, ওসব পরের কথা পরে। উপস্থিত এই রেফ্যুজি মেয়েটির হাত থেকে ওকে কি করে উদ্ধার করা যায় সে চেষ্টা করতে হবে।"

দীপালী বললো, "রজতটা এখনো ছেলেমানুষ। এখনো বুঝতে শেখেনি যে এত বড়ো একটি ফার্মের অফিসারের পক্ষে অফিসের এক স্টেনোকে বিয়ে করা অত্যন্ত অশোভন ও অন্যায় হবে। মা বাবার মনে যে কতোখানি ল্যাগবে একথা তার ভেবে দেখা উচিত নয়?"

"এ বুদ্ধি তোমার ভাইকে একটু একটু করে দিতে আরম্ভ করলেই পারো," মোহিত গালে জিভ রেখে বললো।

ক্ষমা আসতে দুজনেই অন্য কথা পাড়লো।

॥ বারো ॥

ডলি দেশরাজ নিজের মনে একটি চিঠি টাইপ করছিলো, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ছিলো আগের দিন সন্ধ্যেবেলা সে আর রজত দুজনে মিলে ঠিক করা প্ল্যানগুলো।

সামনের মাসে মাইনেটা পেলে পরেই কোর্টে গিয়ে বিয়ে। তারপর দিন পোনেরোর ছুটি নিয়ে দার্জিলিং।

এমন সময় বেয়ারা এসে বললো, সায়েব ডাকছেন।

এমন রাগ হোলো ডলির। যখনই স্বপ্ন দেখে, ঠিক সে সময়ই ডাক পড়ে।

নোট বই আর পেন্সিল তুলে নিয়ে দরজা ঠেলে ডিরেক্টারের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ঢুকে দেখে তাদের অন্যতম ডিরেক্টার চ্যাটার্জিও বসে আছে।

"কাম্ ইন। এখানে এসে বোসো।"

ডলি গিয়ে খাতা খুলে বসলো।

ডিরেক্টার দু'জন তার দিকে একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখলো। ডলি একটু অসোয়াস্তি বোধ করলো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ তারপর—

"মিস্ দেশরাজ !"

"ইয়েস্ স্যর !"

"একটা বিশেষ কাজে ডেকেছি। ইট ইজ ইম্পর্ট্যাণ্ট, ভেরি ইম্পর্ট্যাণ্ট।"

কথা বলছিলো ডিরেক্টার কিশোরীলাল। চ্যাটার্জি চুপ করে বসে পাইপ টানছিলো।

"বলুন—।"

"মিস দেশরাজ, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড্ তুমি খুব একম্প্লিশ্‌ড মেয়ে। সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করেছিলে, তাই না ?"

"তারপর কলেজেও পড়েছিলাম—।"

"আই সি! আচ্ছা, শুনেছি তোমার বাবা লাহোরের খুব নাম-করা ব্যবসায়ী ছিলেন। এক সময় হাই সোসাইটিতে নিশ্চয়ই খুব মেলামেশা করেছো।"

"ওয়েল্, কিছু ডিসেণ্ট ফোক্-এর সঙ্গে সামান্ত কাঁধ ঘষাঘষি করেছি—।"

"তুমি তো খুব ভালো ইংরেজি জানো, হিন্দি তো জানোই, বাঙলাও শুনেছি জানো—।"

"কিছু ফ্রেঞ্চও জানি—।"

"রিয়্যালি? দ্যাট্স্ ফাইন! তা' ছাড়া ইউ হ্যাভ সাছ এ লাভলি ফিগার, ...এ্যাণ্ড গুড লুক্স্—।"

"আই সাপোজ সো, থ্যাঙ্ক 'য়্—।" মনে মনে একটু বিরক্ত বোধ করলো। হঠাৎ সায়েব হয়ে ওঠা এই ভারতীয় বিজনেস্ ম্যাগনেটগুলোর কথাবার্তা এতো অভদ্র!

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো ডিরেক্টার সায়েব।

"তোমার কি মনে হয় তোমার এত পার্ট্স্ নিয়ে এ অফিসের সাধারণ স্টেনো হয়ে তুমি জীবনে কিছু করতে পারবে?"

ডলির বুকটা কেঁপে উঠলো। এসব চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়ার ভূমিকা নয় তো?

"আই হ্যাভ নো চইস্," সে বললো, "আমার তো কেউ নেই! খেটে খেতে হয়। একাজ নিয়ে আমি বেশ খুশী হয়েই আছি।"

ডিরেক্টার একটু চুপ করে রইলো।

তারপর বললো, "ফিল্ম কেরিয়ারটি তোমার কি রকম মনে হয়—?"

ডলির মুখটা একটু উজ্জ্বল হোলো। কিছু বললো না কিন্তু। এদের যে একটি ফিল্ম কোম্পানি আছে, সে জানতো। বেশ নামজাদা কোম্পানি।

"আমরা একটি নতুন বই করছি," ডিরেক্টার বলে চললো, "তিন ভার্শানের বই—হিন্দি, বাঙলা, ইংরেজি। আমাদের ইচ্ছে একজন নতুন

হিরোইন নামাবো। তবে তার আগে আমাদের স্টুডিওতে এখন যে বইটি তোলা হচ্ছে তাতে একটি ইম্পর্ট্যান্ট কিন্তু ছোটো রোল-এ নামতে হবে।"

ডলি জানতো সে কথা। গত সপ্তায় বম্বের এক সিনেমা সাপ্তাহিকে পড়েছিলো সে।

"তুমি যদি রাজী থাকো তো বলো, কাল থেকে প্রেসে পাবলিসিটি হ্যাণ্ড-আউট ছাড়ি। এই উইকে একটি নিউজ করে দি, ইতিমধ্যে বোর্ণ এণ্ড শেফার্ড'স্-এ গিয়ে একটি ভালো ছবি তুলিয়ে আনো—"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না ডলি। এরকম সুযোগ তার জীবনে আসছে? ফিল্ম স্টার··টাকা··নিজের গাড়ি··নিজের বাড়ি, কলকাতায় একটি, বম্বেতে একটি, দার্জিলিঙে একটি, পুরীতে একটি—রজতকে তা'হলে সে আর কাজ করতে দেবে না।

"তা'হলে প্যাক্ আপ এ্যাণ্ড গেট রেডি। সোমবার দিন তোমার সঙ্গে কনট্রাক্ট হবে, তারপর সোজা বম্বে—।"

এদের স্টুডিও বম্বেতে।

রজতকে গিয়ে খবর দেওয়ার জন্যে ডলির মনটা ছটফট করতে লাগলো—।

"কিন্তু একটা কথা। পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের কাজে ছাড়া বম্বে ছাড়তে পারবে না, আমরা অবশ্যি প্রায়ই হিলস্-এ বেড়াতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবো। আর, হ্যাঁ, পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের এ্যাপ্রুভেল ছাড়া বিয়ে করতে পারবে না। জানোই তো, অবিবাহিত মেয়ের বক্স-অফিস অনেক বেশী—।"

এ তো ভালো কথা নয়, ডলি ভাবলো।

একটু চুপ করে থেকে ডলি বললো, "তা'হলে আমার এ অফার নেওয়ার অসুবিধে আছে—।"

"এখনই কিছু বলবার দরকার নেই," ডিরেক্টার বলে চললো, "বাড়ি

গিয়ে ভালো করে ভেবে দেখ। এরকম সুযোগ কারো জীবনে দুবার আসে না। দিন দুই পরে জানিও।"

ডলি থুতনিতে পেনসিল ঠুকতে ঠুকতে ভাবতে লাগলো।

"বাড়ি যাও। ভালো করে ভেবে দেখ, তারপর জানিও। তুমি এখনই যেতে পারো। তোমায় ছুটি দিলাম দু'দিনের। ভেবে দেখ, ভালো করে ভেবে দেখ। দ্যাট্স্ অল মিস দেশরাজ—"

ডলি উঠে পড়লো।

দরজার কাছে যেতেই মোহিত চ্যাটার্জি ডাকলো—"মিস দেশরাজ, জাস্ট এ মিনিট।"

ডলি ফিরে এলো।

"আমি শুনেছি তুমি আর আমাদের মিস্টার রজত সেন খুব বন্ধু," মোহিত চ্যাটার্জি আস্তে আস্তে বললো, "দ্যাট্স্ অল ভেরি গুড। কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে অফিসে ওর সঙ্গে খুব ইন্ফর্ম্যাল না হওয়াই বাঞ্ছনীয়? অফ কোর্স্, অফিসের বাইরে তোমরা যা খুশি করতে পারো। আফটার অল অফিসে সে একজন অফিসার, তুমি জুনিয়ার এম্প্লয়ি—। কিছু মনে কোরো না। ইট্'স্ ওন্লি এ সাজেস্চান্…।"

"নট্ এট্ অল স্যর, আমার মনে থাকবে…।"

"বাই দি ওয়ে, তুমি এটা নিশ্চয়ই জানো যে সে আমার ব্রাদার-ইন্-ল। আমার স্ত্রীর ছোটো ভাই। ডিড হি এভার টেল ইউ দ্যাট্?"

ডিরেক্টার কিশোরীরলাল বাধা দিলো, "মিস্টার চ্যাটার্জি, এসব কথা অবান্তর। কেন ভুলে যাচ্ছেন মিস দেশরাজ পরশু থেকে আর আমাদের এম্প্লয়ি থাকছেন না, উনি আমাদের নতুন বইয়ের নিউ ফাইণ্ড্।"

ডলি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। নিজের ডেস্কে এসে কাগজপত্তর গুছিয়ে তুলে রেখে, ব্যাগটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

* * * * * *

সন্ধ্যেবেলা ঝড়ের মতো এসে উপস্থিত হোলো রজত।

"ডলি, তোমায় নাকি ওরা হিরোইনের রোল অফার করছে? অফিসে সবাই বলাবলি করছে—।"

"হ্যাঁ। আজ কনট্রাক্ট অফার করলো।" ডলি হাসি মুখে বললো।

রজত খুব খুশী হয়ে চেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে বসলো।

"তা হলে আমাদের ডলি শুধু আমার নয়, দেশসুদ্ধ লোকের সুইট্‌-হার্ট হতে চললো," বললো রজত।

"কতো লোকে আমায় চিঠি লিখবে—।"

"তোমার ছবির পোস্টার রাস্তার এদিকে ওদিকে সাঁটা থাকবে—।"

"প্রত্যেক কাগজে ছবি বেরুবে—।"

"একবারটি শুধু দেখবার জন্যে লোকে রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়াবে।"

"আমার রুচি, পছন্দ, হবি, দৈনন্দিন রুটিন সম্বন্ধে প্রেস রিপোর্টারের উৎসুক হবে—।"

"তুমি কোন রঙের শাড়ি পড়তে ভালোবাসো ডলি—?"

"হলদে, কটকটে হলদে......, একেবার ক্যানারি রং।" ডলি চোখ পাকিয়ে বললো।

"কি খেতে ভালোবাসো?"

"আলু, নৈনিতাল আলু......।" ডলি হাসতে লাগলো।

"তোমার হবি কি?"

"ব্যাঙ পোষা......।"

"তোমার জীবনের আদর্শ কি?"

"একজনের পর একজনের সঙ্গে প্রেম করা......।"

ডলি, রজত, দু'জনেই হাসতে লাগলো খুব।

ডলি চা করে খাওয়ালো রজতকে। অনেকক্ষণ গল্প করলো।

তারপর বললো, "রজত—— !"

একটু অন্যরকম শোনালো ডলির গলা। হাল্কা আবহাওয়া হঠাৎ ভারী হয়ে এলো।

"কি ?" রজত জিজ্ঞেস করলো।

"তোমায় একটা কথা বলবো ভাবছিলাম—।"

"বলো······।"

"কথাটা খুব তেতো শোনাবে, কিন্তু আমাদের ভালোর জন্যেই বলছি।"

"ব্যাপার কি ডলি ?"

"দেখ, জীবনে কেরিয়ারটাই হোলো আসল জিনিস, কেরিয়ারের জন্যে অনেক কিছু করতে হয়—," ডলি বললো।

কাকে যেন এ কথা বলেছিলো সেদিন, রজত ভাবতে লাগলো। হ্যাঁ, শ্যামলীকে—।

"এসব ব্যাপার নিয়ে সেন্টিমেন্ট্যাল হতে নেই," ডলি বলে চললো।

"মানে ?"

"ভালোবাসবার লোক জীবনে অনেক আসে রজত, কিন্তু কেরিয়ার তৈরি করবার সুযোগ একবারের বেশী আসে না—।"

"তুমি কি বলতে চাইছো ?"

"আমি শিগ্‌গিরই বম্বে যাচ্ছি। পাঁচ বছরের মধ্যে আর এদিকে আসবো না হয়তো। তা'ছাড়া আমার এখন বিয়ে করার অসুবিধে আছে—।"

এতক্ষণে বোধগম্য হোলো রজতের। কিন্তু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হোলো না। কি বলছে ডলি।

"রজত, তুমি আর আমি নিশ্চয়ই চিরকাল খুব বন্ধু থাকবো, কিন্তু—দেখ, বিয়েটা ছেলেখেলা নয়, পরিবারের অন্য সবার কথা ভাবতে হয়, নিজেদের সমাজ, এটা ওটা সেটা অনেক কিছু বিবেচনা করতে হয়···।"

রজত চুপ করে শুনছিলো। এবার আস্তে আস্তে বললো, "ডলি, তোমার ফিল্মে গিয়ে কাজ নেই।"

"সে হয় না রজত", ডলি বললো।

রজত শুনলো না। ডলির চোখে চোখ রেখে বলে গেল, "তুমি জানো, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না। আমার যা কিছু সুখ, যা কিছু শান্তি, সব তুমিই দিয়েছো, তোমার জন্যে আমি সবাইকে ছাড়তে রাজী আছি···।"

"ছেলেমানুষি কোরো না রজত—।"

"তোমায় আর ফিল্মস্টার হতে হবে না।"

ডলি তাকিয়ে দেখলো রজতকে। তারপর মৃদু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, "তোমার কেরিয়ার আমি করে দিলাম, আর তুমি এবার আমার কেরিয়ার করে নেওয়ায় বাধা দিতে চাও— ?"

রজত অবাক হয়ে তাকালো ডলির দিকে। তার মুখ তখন মাঝরাত্তির হয়ে গেছে।

ডলি মুখ ফিরিয়ে নিলো। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো বাইরের প্রশান্ত নীল আকাশ। একটু হাসি ঝিলমিল করে উঠলো তার মুখে। আস্তে আস্তে বললো, "রজত, তুমি আমি মিলে বেশ কয়েকটি মিষ্টি দিন কাটিয়েছি, আজ শেষ মুহূর্তে ঝগড়া করে তার স্মৃতি তেতো করে দিয়ো না। তুমি আমার জন্যে অনেক করেছো, আমিও হয়তো তোমার জন্যে সামান্য কিছু, যা আমার সাধ্যে কুলোয়, করেছি। আমরা চিরকালই বন্ধু থাকবো। তার বেশী কিছু হওয়া বোধ হয় আমাদের দুজনের পক্ষেই ক্ষতিকর হবে।"

রজত অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তাকিয়ে দেখলো ডলিকে। তারপর বললো, "এই তোমার শেষ কথা— ?"

"ডোণ্ট বি সেন্টিমেণ্ট্যাল রজত— !"

রজত উঠে দাঁড়ালো। গম্ভীর গলায় বললো "বেশ, তুমি যদি তাই

চাও তবে তাই হোক। তবে, বন্ধু টন্ধু আর নয়, আমি আর তোমায় আমায় মুখও দেখাবো না। এখানেই সব সম্পর্ক চুকে যাক।"

ডলি একটু হাসলো। "এ্যাজ ইউ প্লীজ—। এতে তুমি যদি খুশী হও, আমার মনে হয় এর চেয়ে কন্‌ভিনিয়েণ্ট এরেঞ্জমেণ্ট্ আর হতে পারে না।"

রজত আস্তে আস্তে বললো, "চলি তা'হলে। উইশ্ ইউ সাকসেস্ এ্যাণ্ড বেস্ট অফ লাক্—।"

ডলি হাত বাড়িয়ে দিলো। রজত হাতটি নিলো নিজের হাতের মধ্যে। ডলি গরম চাপ দিলো রজতের হাতের উপর।

"তুমি সুখী হও রজত," ডলি কোমল গলায় বললো। "আমি আর কিছু চাই না—"

"সুখী হওয়ার ব্যবস্থা তুমি যা করলে তা' তো দেখতেই পাচ্ছি," রজত বাঁকা হাসি হেসে বললো।

ডলি হাসলো একটুখানি।

রজত চলে গেল। ফিরেও তাকালো না।

ডলি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো জানলায়।

পার্ক সার্কাসের মোড়ে প্রবাল দাঁড়িয়ে ছিলো ট্রামের জন্যে। দেখলো রজত টলতে টলতে আসছে।

একটু বিস্মিত হোলো প্রবাল। মদ্যটদ্য পান করেছে নাকি ?

"রজত !"

রজত চমকে উঠে ফিরে তাকালো। "ও, প্রবাল দা', তুমি ?" কাছে এলো সে।

কোনো মদের গন্ধ নেই। বেশ সহজ কথাবার্তা।

"কি হয়েছে তোমার ?"

"কিছু না—।"

"এ রকম ঝোড়ো পাখির মতো দেখাচ্ছে— !"

"ঝড় বয়ে গেছে বলে," রজত হাসতে হাসতে উত্তর দিলো।

"মানে ?"

"কিছু না। এমনি বল্লাম। কোথায় চল্লেন ? সুমিতা দি'র বাড়ি ?"

"তুমি কদ্দুর ?" প্রবাল জিজ্ঞেস করলো।

"একটু বড়দি'র ওখান থেকে ঘুরে আসি।"

"শ্যামলী, রূপালী, এদের কি খবর ? ভালো আছে সবাই ?"

"হ্যাঁ— ।"

প্রবাল আর কি জিজ্ঞেস করবে ভেবে পেলো না।

রজত বললে, "আচ্ছা আমি যাই, পরে দেখা হবে।"

"আচ্ছা।"

রজত চলে গেল।

খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে এলো সে।

"প্রবাল দা'। একটা নতুন খবর শুনবেন ?"

"কি খবর ?"

"ডলি বম্বে চলে যাচ্ছে। ফিল্মে অফার পেয়েছে।"

"তাই নাকি ? বেশ, বেশ, খুব খুশী হলাম শুনে— ।"

রজত একটু চুপ করে থেকে বললো, "ও আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে।"

"সে কি ?"

রজত আর কিছু বলতে পারলো না। ফ্যাকাশে হাসি হেসে চলে গেল।

প্রবাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো আনমনে।—সেই ডলি দেশরাজ, সেদিন এত গল্প, এত আড্ডা, এত হৈ হৈ, পরে দেখা হয়েছে আরো কয়েকবার। রজতের জন্যে এত করে ডলি শেষ পর্যন্ত……

একটা ট্রাম চলে গেল, দুটো ট্রাম চলে গেল, প্রবালের খেয়াল নেই। তারপরের ট্রামটি আসতে হুঁশ হোলো।

তখন কলকাতার ফিকে সোনার গোধূলি সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

রেইনি পার্কের বাড়িটির কম্পাউণ্ডে তখন অসংখ্য জোনাকি এসে ভিড় করছে হাস্নুহানার ঝাড়টির চারপাশে।

উপরের জানলায় দাঁড়িয়ে তাই দেখছিলো মোহিত চাটার্জি।

ঘরের ভিতর রকিং চেয়ারে বসে একটি আমেরিকান ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে যাচ্ছিলো দীপালী।

জিজ্ঞেস করলো, "তুমি আজ বেরুলে না যে? কেউ কি আসবে?"

"রজতকে আসতে বলেছিলাম," মোহিত উত্তর দিলো।

একটু চুপ করে থেকে দীপালী জিজ্ঞেস করলো "ওকে রাজী করাতে পারবে?"

"কিসে?"

"ঋমুকে বিয়ে করতে?"

"আশা করি পারবো," মোহিত বললো, "আজ তো তার ব্যবস্থা সমাপ্ত করেছি।"

"তাই নাকি? কি করে করলে?"

"মগজ খাটালে কী না হয়? রজত তো ডলি দেশরাজের জন্যে পাগল, ওকে সরাই কি করে? রতনলালকে বলে ডলিকে অফার দেওয়ালাম, ওদের বম্বের কোম্পানির একটি কনট্রাক্ট। এক্ষুনি বম্বে যেতে হবে। ডলি রাজী হয়ে গেল। সে চাকরিতে রিজাইন দিলো আজ।—ওই যে রজত আসছে। ওর মুখেই শুনবে। ধৈর্য ধরো।"

একটু পরেই রজত উপরে উঠে এলো।

"বাড়ির সবাই ভালো?" দীপালী জিজ্ঞেস করলো। "মা ভালো আছেন? শ্যামলী? রুপু? ও তো আজকাল লেবার মুভমেন্ট করছে, তাই না? আজকালকার মেয়েগুলো কী হচ্ছে দিনকে দিন! তোর মুখ অতো শুকনো কেন? কি খাবি? চা না আইসক্রীম। বোস্, আমি আসছি।"

দীপালী উঠে গেল।

"কি খবর ভায়া?"

"আপনি জানেন না?" রজত শুকনো গলায় বললো। "ডলি বম্বেতে ফিল্মে অফার পেয়েছে। থাকবে না এখানে। সে আমায় বললো, আমি যেন তাকে ক্ষমা করি। সে চলে যাচ্ছে, একটি কেরিয়ার পেয়ে গেছে সে, আর আটকে থাকবে না এখানে। আমি যেন কিছু মনে না করি, দু'দিনের ব্যাপার, দু'দিন পরে কিছু মনে থাকবে না।"

মোহিত চ্যাটার্জি একটু হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না।

একটু চুপ করে থেকে রজত বলে চললো, "আমি আর কিছু বলিনি। চলে যেতে চাইছে যাক। আমি আটকানোর কে? বললে শুনবেই বা কেন? গাধা মেয়েটা জানে না তাকে আমি কি রকম ভালবাসি। কতো অপমান সহ্য করেছি ওর জন্যে, বাড়ি ছাড়তে হচ্ছে, দিদিকে বোনকে ছাড়তে হচ্ছে—।"

"তাতে কি ভায়া," পিঠ চাপড়ে মোহিত বললো, "ডোণ্ট বি সো সেণ্টিমেণ্ট্যাল। একটি দিদি ছাড়ছো, আরেকটি দিদিকে পেয়ে গেছ। একটি প্রিয়া চলে গেছে, আরেকজন আসবে। জীবনটা এরকমই। কেরিয়ারের জন্যে অনেক কিছু করতে হয় ব্রাদার!"

রজত চোখ তুলে তাকালো। মনে পড়লো একথা সে বলেছিলো শ্যামলীকে। আর একথাই ডলি দেশরাজ বলেছে তাকে।

রজতকে বসিয়ে রেখে মোহিত ভিতরে চলে গেল।

গিয়ে বললো, "জানো দীপু, আমি যা ভেবেছি, তাই হয়েছে। সেই পাঞ্জাবী মেয়ে ডলিকে কাটানো গেছে।"

"ক্ষমুর কথাটা আজই পাড়বে নাকি ?" দীপালী জিজ্ঞেস করলো।

"না, আজ থাক, ওভারডোজ হয়ে যাবে। আজ ওর মনে একটু বিরহ বিরহ ভাব হয়ে আছে। ওকে ক্লাবে নিয়ে যাচ্ছি। পেটে দু' এক পেগ্ পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে," মোহিত উত্তর দিলো।

দীপালী বললে, "তুমি নিজে তো গোল্লায় গেছ, আবার ওকে নষ্ট করতে যাচ্ছো কেন ?"

"নষ্ট করতে যাচ্ছি ?" চোখ কপালে তুলে মোহিত বললো, "আরে, কী আশ্চর্য ! তোমার ভাই সে, আমি তাকে নষ্ট করবো একথা কি করে ভাবতে পারলে ? ওকে স্টীল পেয়েছি আমি, এবার গড়ে পিটে আসল মাল তৈরি করবো।"

কিছুক্ষণ পর রজতকে নিয়ে মোহিত বেরিয়ে গেল।

আর জানলায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো দীপালী।

তখন পূবে অশথ্ গাছের আড়ালে চাঁদ উঠেছে। আস্তে আস্তে মনে পড়ে গেল অনেকদিন আগেকার কথা। শেয়ালদার কাছাকাছি একটি গলির ভেতর একটি পুরোনো বাড়ির দোতলার একটি ঘর। একপাশে খাটের উপর নাক ডাকিয়ে বাবার ঘুম। রান্না-ঘর থেকে ডালে ফোড়ন দেওয়ার গন্ধ, মা কাজে ব্যস্ত সেখানে। মেঝের উপর মাদুর পেতে বর্ণ-পরিচয় পড়ছিলো ইজের পরা শ্যামলী, তারপর পড়ার মাঝখানে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কড়িকাঠ থেকে দড়ি ঝুলছে, তা'তে একটি বেতের দোলনা বাঁধা। বাচ্চা ভাই রজতকে দুলিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে বড় বোন দীপালী। এমন সময় জানলার ফাঁক দিয়ে ও'বাড়ির ছাতের আড়াল থেকে চাঁদ উঠে এলো। কোথায় ঘুম দুষ্টু ছেলে রজতের চোখে ? এই টুকুটুকু আঙুলগুলো চাঁদের দিকে বাড়িয়ে বলে উঠলো—টি' দিয়ে যা !

কোথায় ভেসে চলে গেল সেই দিনগুলো·········।

॥ তেরো ॥

বিধবা দিদি আর ভাগ্নেকে নিয়ে প্রসাদ থাকতো পার্ক সার্কাসের এক প্রান্তে দিলখুসা স্ট্রীটে একটি দু' রুমের ফ্ল্যাট নিয়ে। সকাল বেলা সেখানে এসে উপস্থিত হোলো রুপালী।

তক্তাপোশের উপর বসে বাঙলা কাগজ পড়ছিলো প্রসাদ। রুপালীকে দেখে অবাক হোলো!

দু' চার কথার পর রুপালী জিজ্ঞেস করলো, "কাজের চেষ্টা করছেন কোথাও?"

"না," প্রসাদ বললো, "চাকরি করবার ফুরসত আর পাবো না। ট্রেড ইউনিয়ানের কাজ নিয়েই পড়ে থাকতে হবে। তোমার কি খবর?"

"একটি স্কুলে চাকরি নিয়েছি।"

"বেশ করেছো। এবার বিয়ে থা' করে একটু সোয়াস্তিতে থাকবার চেষ্টা করো তো।"

"আপনি আমায় ও কথা বলছেন?" রুপালী জিজ্ঞেস করলো। "যে সব কাজের মধ্যে আপনি নিজেই আমায় টেনে নিয়েছিলেন, সেখান থেকে আমায় সরে যেতে বলছেন?"

প্রসাদ একটু হেসে চুপ করে রইলো।

রুপালী বলে চললো, "আমি বিয়ে করছি না আপনাদের হরিদাসকে। সারা রাত ভেবে সকালে উঠে স্থির করলাম। আজই বলবো ছোড়দিকে।"

"তোমার মা মনে খুব দুঃখু পাবেন। এক মেয়েরও যদি বিয়ে না হয়—"

"কেন, শ্যামলীর তো হচ্ছে—।"

"অন্তত আমার সঙ্গে নয়।"

"কেন?"

"আমি বেকার মানুষ, চাল নেই, চুলো নেই, চাকরিটি গেল। দিদিকে বলে দিয়েছি সম্বন্ধ ভেঙে দিতে—।"

রুপালী চুপ করে রইলো।

প্রসাদ বললো, "বেচারা হরিদাস! একই জায়গায় পর পর দু'বার বিয়ে ভেঙে যাওয়া ওর পক্ষে মর্মান্তিক হবে।"

কিছু বললো না রুপালী।

প্রসাদ বলে চললো, "এ সব পাগলামি কোরো না। বিয়ের ঠিক হয়ে আছে, বিয়ে করে ফেল লক্ষ্মী মেয়ের মতো। আমি একথা বলতে পারি তুমি সুখী হবে।"

"আপনি আমার সুখ অসুখের কী বোঝেন?" রুপালী আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো। "আপনি একেবারে অন্ধ, চোখে কিছুই দেখতে পান না।"

কি যেন ছিলো রুপালীর গলায়, প্রসাদ চোখ তুলে তাকালো।

"আপনাকে কিছু বুঝিয়ে না দিলে আপনি বোঝেন না?"

"রুপালী!"

"এদ্দিন আপনি আর আমি এক সঙ্গে পাশাপাশি কাজ করলাম, আজ ওসব ভুলে গিয়ে আরেকজনের বাড়ি গিয়ে সংসার করা খুব সহজ, না?"

রুপালীর গলাটা কেঁপে গেল।

প্রসাদ চুপ করে বসে রইলো অনেকক্ষণ। নিজের মনের অতলে ডুব মারলো বার বার। আস্তে আস্তে মনে হোলো মনের একটা ভার যেন কেটে গেছে।

কী আশ্চর্য!—সে ভাবলো,—আমি নিজের মন এদ্দিন বুঝতে পারিনি কেন?

একটু হেসে আস্তে আস্তে বললো, "রুপালী, আমার সব কিছু অগোছালো, এলোমেলো। আমার ভার নিতে পারবে?"

রুপালী চোখ তুলে তাকালো। একটু কেঁপে গেল তার ঠোঁট দুটো,

আস্তে আস্তে বললে, "এই সহজ কথাটি বুদ্ধি করে দু' দিন আগে বলতে পারোনি ! এ দু'দিন এতো কষ্ট পেতাম না তা' হলে· · ·"

বিকেল বেলা প্রসাদ এলো নীরজার কাছে। খুলে বললো সব। অনুমতি চাইলো।

নীরজা সব শুনে শুধু বললেন, "তোমরা যা ভালো বোঝো করো।"

শ্যামলী পাশে বসেছিলো। শুনে হাসলো। এত মিষ্টি, এত সহজ হাসি সে হাসেনি অনেকদিন।

পাশের ঘরে তক্তাপোশের উপর উপুড় হয়ে শুয়েছিলো রুপালী। শ্যামলী এসে ঘরে ঢুকলো, এসে বসলো রুপালীর পাশে।

বললো, "বিয়ের বর পাল্টে গেলেও তারিখটা পাল্টাবে না, কি বলিস্ ?" বলে রুপালীকে টেনে নিলো বুকের মধ্যে।

রুপালী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো ছোট্টো মেয়েটির মতো।

সামনের দেওয়ালে উমাকান্তর এনলার্জ করা ছবি টাঙানো। সেদিকে তাকিয়ে শ্যামলীর চোখ দুটিও জলে ভিজে এলো।

॥ চোদ্দো ॥

তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা শানাই বেজে উঠলো কণা আদকারী লেনের একটি বাঁকে। দোতলার জানলা থেকে ভেসে এলো উলু আর শাঁখের আওয়াজ। পাড়ার মেয়েরা বেনারসী শাড়ি পরে আলতায় পা রাঙিয়ে ভিড় জমালো রুপালীদের বাড়ি। শ্যামলী শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে ঘামে ভেজা কপাল বার বার রুমাল দিয়ে মুছে অভ্যাগতদের তদারক করে বেড়াতে লাগলো।

বিয়েতে এলো অনেকেই,—প্রবাল এলো, সুমিতা এলো, মোহিত দীপালী, ক্ষমা, সবাই এলো।

হরিদাসকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিলো, কিন্তু সে আসবে শ্যামলী ভাবতে পারেনি। যখন দেখলো তার মেয়েটিকে নিয়ে সে সত্যিই এলো, মনে মনে বড্ডো কুন্ঠিত হোলো শ্যামলী, তাকে নিয়ে বসালো নিজের ঘরে, নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালো।

খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ি ফেরার সময় হরিদাসের মেয়েটি কিছুতেই নামবে না শ্যামলীর কোল থেকে।

হরিদাস বললে, "ও এই ক'দিন খুব বলছিলো আপনার কথা। তাই নিয়ে এলাম।"

"আপনি আসবেন আশা করিনি," শ্যামলী উত্তর দিলো, "আপনার কাছে আমার আর মুখ দেখানোর রাস্তা রইলো না—।"

"ওসব কথা আবার কেন তুলছেন," হরিদাস বাধা দিলো শ্যামলীর কথায়, "রুপালী নিজে পছন্দ করে বিয়ে করেছে প্রসাদ দা'কে, এর উপর

কারো কোনো কথা বলা উচিত নয়। আমি খুব খুশ হয়েছি।" একটু চুপ করে থেকে বললো, "আমি শুধু ভাবছি আপনার কথা।"

"আমার জন্যে ভাববার কি আছে?" শ্যামলী হেসে বললো।

একটু লজ্জা পেলো হরিদাস। উত্তর দিলো, "না, এমন কিছু নয়, ভাবছিলাম আপনি এত ভালোবাসেন সবাইকে, মানে আপনার ভাই বোনকে, আর—" কথা শেষ না করেই থেমে গেল সে।

"—আর কী?" শ্যামলী হেসে জিজ্ঞেস করলো।

একটু ইতস্তত করলো হরিদাস। বললো, "না, এমন কিছু নয়,—সবাই যে যার মতো নতুন সংসার পেতে সরে যাচ্ছে, আর আপনি একা হয়ে পড়লেন।"

শ্যামলী হাসলো। "একা হয়ে পড়বো কেন, বাঃ রে, এভাবে তো আমার আপনজনের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।"

ওর কোল থেকে মেয়েকে নিতে গেলো হরিদাস। মেয়েটি কিছুতেই নামবে না। বাপকে বললো, "মাসীমাকে নিয়ে চলো আমাদের বাড়ি।"

শ্যামলী বললে, "এ আজ থাক না আমার সঙ্গে। কাল কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো কিংবা লোক না পেলে আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসবো।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো হরিদাস। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "আপনি যাবেন আমাদের বাড়ি?"

"কেন যাবো না?" শ্যামলী অবাক হোলো একটুখানি।

হরিদাস ঘেমে উঠলো। বললো, "কাল যাওয়ার কথা বলছি না। মানে—মেয়েটি আপনাকে এত ভালোবাসে—ও যদি নিজের মায়ের মতোই আপনাকে পায় আমাদের বাড়িতে—তাই বলছিলাম কি—অর্থাৎ মানে—আপনাকে অনেক আগেই বলতাম—মাঝখানে আপনি এমন চেপে ধরলেন আপনার বোনকে বিয়ে করবার জন্যে, ঠিক ভরসা করে বলতে পারিনি।—

'হয়তো খুব অবাক হচ্ছেন শুনে—কিন্তু………," হরিদাস কথাটা কি করে শেষ করবে ভেবে না পেয়ে থেমে গেল।

শ্যামলী কোনো উত্তর দিলো না। শুধু মেয়েটিকে চেপে ধরলো বুকের মধ্যে।

হরিদাস আস্তে আস্তে বললো, "বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য, এসব দেয়ার মতো কিছু আমার নেই। তবে ছোট্টো একটি নিরিবিলি সংসার, অনেক অভাব অসুবিধের মধ্যেও একটি মিষ্টি জীবন, একটুখানি ভালোবাসা, শান্তি, এ যদি আপনার খুব সামান্য মনে না হয়, তা'হলে……," আবার কথার খেই হারিয়ে গেল।

শ্যামলী শুনে গেল চুপচাপ।

কোনো উত্তর না পেয়ে ম্লান হয়ে গেল হরিদাসের মুখ।

বললো, "হয়তো বড্ড অশোভন ব্যবহার করলাম আপনার সঙ্গে। ক্ষমা করবেন আমায়। আমি এবার উঠি।"

কোনো কথা বললো না শ্যামলী।

হরিদাস উঠে পড়লো।

ঘর থেকে বেরুতেই শ্যামলী ডাকলো পেছন থেকে। সে ফিরে দাঁড়ালো। শ্যামলী কাছে এসে বললো, "আমার সব কিছু জেনেও বলছেন?"

"সব কিছু জেনেই বলছি," হরিদাস উত্তর দিলো।

"মনে আছে, দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার পাড়ে বসে আপনি বলেছিলেন, আপনি অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারবেন না—।"

"সে কথা আমি আজো বলছি।"

"মানে?"

"আমি তো সেদিন রূপালীর কথা বলিনি, শ্যামলীর কথাই বলেছি। শুধু নামটি মুখে আনিনি, এই যা।"

"তবে রুপালীকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলে কেন?" শ্যামলী জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি যে বলেছিলে আমি রুপালীকে বিয়ে করলে তুমি সুখী হবে, সেজন্যেই," হরিদাস উত্তর দিলো।

শ্যামলী একটু হাসলো। বললো, "তুমি বড্ড ছেলেমানুষ এখনো। অনেক রাত হোলো। বাড়ি যাও এবার। কাল মেয়েটিকে পাঠিয়ে দোবো। —আচ্ছা, না হয় তুমি নিজে এসেই নিয়ে যেও।"

"আমি আসবো?"

"হ্যাঁ, এসো।" শ্যামলীর কান দুটো যেন রাঙা হয়ে উঠলো একটুখানি।

বাসর ঘরে কমে এলো মেয়েদের ভিড়। শেষ পর্যন্ত আর কেউ রইলো না।

চুপচাপ বসে ছিলো প্রসাদ আর রুপালী।

বিয়ের রাত্তিরে চিরকালের প্রত্যেক দম্পতির মতো এদেরও মনের উপর দিয়ে পুরোনো দিনের অনেক স্মৃতির মিছিল বয়ে গেল।

অনেকের কথা মনে পড়লো প্রসাদের। তাদের চেনে না রুপালী।

মনে পড়লো রুপালীর। তাদের চেনে না প্রসাদ।

তারপর দু'জনেরই মনে পড়লো অন্য কয়েকজনকে। তাদের দু'জনেই চেনে।

সবার শেষে দুজনারই মনে পড়লো একজনের কথা।

দু'জনেই আনমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলো। মুখ ফিরিয়ে তাকালো দু'জনার দিকে।

"দিদির কথা ভাবছি," রুপালী বললো।

"আমিও," বললো প্রসাদ।

"ও আমাদের সব্বাইকে বড্ড ভালোবাসে। শ্যামলীর মতো দিদি আর হয় না।"

* * * * * *

গাড়ি চালাচ্ছিলো মোহিত। রজত বসেছিলো পাশে। রুপালী আর শ্যামলীর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর সে আর এ বাড়িতে থাকতো না। থাকতো একটি হোটেলে।

পেছনে বসেছিলো দীপালী আর ক্ষমা।

"ওরা বেশ আছে—," দীপালী বললো।

"আমিও বেশ ছিলাম—," আস্তে আস্তে বললো রজত।

"আমরা ভাইবোনেরা তো যে যার মতো ছিটকে পড়লাম। শ্যামলী এবার কি করবে জানিস্," দীপালী জিজ্ঞেস করলো।

"জানি না কি করবে," রজত উত্তর দিলো, "তবে এটুকু জানি যে সব চেয়ে সুখে থাকবে ছোড়দি। জীবনের সমস্ত দুঃখ বেদনার মাঝখান থেকে কি করে সুখটুকু তুলে নিতে হয় মাখনের মতো, সে জানে। তাই সে আঘাত পেলেও, কোনোদিন ব্যথা পায় না।"

একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললো, "শ্যামলীর মতো দিদি আর হয় না।"

সবার আড়ালে একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো দীপালী।

মোহিত, ক্ষমা—এরা কেউ লক্ষ্য করলো না।

সুমিতার গাড়ি যাচ্ছিলো পাশ কাটিয়ে। ক্ষমা হাত ঢেউ খেলালো।

সুমিতা আর প্রবাল বাড়ি ফিরছিলো চৌরঙ্গি ধরে।

একপাশে প্রচুর আলো আর জনতা, অন্যপাশে গাঢ় অন্ধকার নির্জনতা, তারই মাঝখান দিয়ে পথ চলে গেছে। সেই পথে চলতি গাড়ির ভিতর ওরা চুপচাপ বসে ছিলো পাশাপাশি।

সুমিতা বললো, "কি অতো ভাবছো প্রবাল ?"

প্রবাল কোনো উত্তর দিলো না।

সুমিতা জিজ্ঞেস করলো, "রুপালী শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলো একজন বেকার সুপারভাইজারকে—?"

"তবে কাকে বিয়ে করবে?"

"কেন? খুঁজে পেতে একটি ভালো শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দেওয়া যেতে পারতো। মোহিত চ্যাটার্জির শালী আর রজত সেনের বোনের জন্যে কি ছেলে জুটতো না?"

"প্রসাদ বেশ ভালো ঘরের ছেলে," প্রবাল বললো, "আর তা' যদি নাও বা হোতো, কী লাভ হোতো বড়ো ঘরে বিয়ে হয়ে?"

"কেন? মোহিতকে বিয়ে করে দীপালীর কোনো লাভ হয়নি? ক্ষমাকে বিয়ে করে রজতের কোনো লাভ হবে না?"

"বিয়েটা লাভ-ক্ষতির ব্যাপার নয় সুমিতা," প্রবাল উত্তর দিলো, "সুখী হওয়ার জন্যেই বিয়ে করা। প্রসাদকে বিয়ে করে রুপালী যে সব চেয়ে বেশী সুখী সেটাই সব চেয়ে বড়ো কথা।"

সুমিতা চুপ করে রইলো।

"তার চেয়েও বড়ো কথা আছে," প্রবাল বলে চললো, "আজকের দিনের সমাজ-কাঠামোতে যারা মাঝারি তাদের বাঁচতে হবে ছোটোদের দলে ভিড়ে, কারণ যারা বড়ো তারা মাঝারিকে চারদিক থেকে চেপে ঠেলে দিচ্ছে ছোটোদের পর্যায়ে। সেই মাঝারিদের মধ্যে কয়েকজন যারা মাঝারির দল থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে বড়োদের দলে ভিড়ে গিয়ে বড়োদের পর্যায়ে উঠে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে, তারা বড়ো অভাগা, কারণ তারা জানে না যে সমাজ-কাঠামোতে যারা আজ বড়ো, তাদের এড়িয়ে পুরো সমাজ-কাঠামোটাই আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। মাঝারি বড়ো হবে বড়োর দলে ভিড়ে নয়, ছোটোদের দলে ভিড়ে নতুন সমাজব্যবস্থার মধ্যে। এই পটভূমিকায় ফেলে যখন ভেবে দেখি রুপালীর বিয়ের ব্যাপারটা, তখন মনে হয় দীপালীর যে পরিণতি হয়েছে, রজতের যে পরিণতি হতে যাচ্ছে, রুপালীর তা' হবে না,

সে তার নিজের জীবনকে সমাজের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে ঠিক মিলিয়ে দিয়েছে।"

কোনো কথা বললো না স্থমিতা। প্রবালও চুপ করে গেল।

প্রবাল নিজের মনে ভেবে চললো এর ওর তার কথা।

মনে পড়লো শ্যামলীকে—।

ভাবলো, মানুষের আশা আর কামনা আর স্বপ্ন দিয়ে গড়া তাসের ঘরগুলো না টেকে যদি নাই বা টিকলো, কি আসে যায় তা'তে। তবু যে কিছুক্ষণের মতো খেলাঘরের রাজা আর রানী নিয়ে সেই তাসের ঘরের আশ্রয় নানা রঙে রঙিন হয়ে অসাধারণ হয়ে বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে, তার জন্যে জীবনকে যে কোনো চড়া দাম দিয়েও নিঃস্ব মনে হয় না নিজেকে।

সার্কুলার রোডের মোড়ে এসে প্রবাল নেমে গেল।

"এখানে নামতে চাইছো কেন? চলো না, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দি," স্থমিতা বললো।

"না, তোমায় এত রাত্তিরে অদ্দূর টেনে নিয়ে যাবো না। আমি এখান থেকে ট্রাম ধরে চলে যাবো।"

স্থমিতার গাড়ি বাঁয়ে ঘুরে চলে গেল।

ট্রাম স্টপে প্রবাল একা দাঁড়িয়ে রইলো।

ট্রাম আসে না অনেকক্ষণ—।

চৌরঙ্গির পূব দিকে সারি সারি নিঝুম বাড়ি। তার ওপার থেকে চাঁদ উঠেছে। ডাইনের ময়দান আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল নীল থেকে রুপালী-নীল, তারপর দুধের মতো সাদা হয়ে এলো।

এমন সময় প্রবাল দেখে ওপারের ফুটপাথ থেকে রাস্তা পেরিয়ে ট্রাম স্টপে এসে দাঁড়ালো ডলি দেশরাজ।

"আপনি ?" ডলি জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ, একটি বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছি", প্রবাল উত্তর দিলো। "তারপর, কি রকম আছেন? শুনলাম আপনি নাকি ফিল্মে কনট্রাক্ট নিয়ে বম্বে যাচ্ছেন ?"

"কে বল্লে ?"

"সুমিতা বলছিলো—," রজতের নাম আর করলো না প্রবাল।

ডলি চুপ করে রইলো, তারপর বললো, "না, যাচ্ছি না।"

প্রবাল কোনো কথা বলতে পারলো না, একটা ব্যথার সুর অনুভব করলে ডলির কথায়। অপেক্ষা করলো তার নিজের থেকে বলার।

নিজের থেকেই বললো ডলি দেশরাজ। আজ সে একেবারে একা, মনের কথাগুলো বুকের মধ্যে গুরুভার হয়ে জমে আছে।

বললে, "কানাঘুষো শুনছিলাম রজত মোহিত চ্যাটার্জির শালা। আমি আগে জানতাম না। আরো শুনলাম চ্যাটার্জি সায়েব তার বোনের সঙ্গে রজতের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সেদিন হঠাৎ ডিরেক্টার ডেকে পাঠালেন। চ্যাটার্জি সায়েবও ছিলেন। বললেন, আমার জন্যে নাকি একটি রোল আছে তাদের ছবিতে। বম্বে যেতে হবে। আমি কচি খুকী নই, আমার কী আছে যে আমায় কেউ হিরোইন করবে। এ শুধু আমাকে সরানোর চেষ্টা। আমি ভাবলাম আমি আর থেকে কী করবো, আমি সরে যাই, ভালো ঘরে বিয়ে করলে রজত জীবনে আরো উন্নতি করবে।"

প্রবালের মন দুলে উঠলো।

ডলি বলে চললো, "বেচারা জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে। আমায় বিয়ে করে ওর আর কী লাভ হবে। আমি ডিরেক্টারকে বললাম, হ্যাঁ, বম্বে যেতে আমি রাজী। সায়েবেরা শুনে খুব খুশী। তারপরদিন রেজিগ্‌নেশান দিলাম। রজতকে বললাম, আমি চলে যাচ্ছি। সে রাগ করলো, রাগ করে চলে গেল। বেশ বুঝলাম ওর মনে খুব লেগেছে। তবু ডাকলাম না। আমি অফিস

ছেড়ে চলে এলাম, তবে বম্বে আমি যাচ্ছি না। ওই ফিল্ম লাইনে আমার শখ নেই।—রজতকে কিছু বলবেন না।"

তখনো ট্রামের দেখা নেই।

"এবার কী করবেন," প্রবাল আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

"একটি এয়ার লাইনস্‌এ এয়ার হস্‌টেস্‌ নিচ্ছে। একজন উপরওয়ালার সঙ্গে চেনা আছে, তাকে ধরলে হয়তো পেয়ে যাবো চাকরিটা।"

ডলি দেশরাজ আর কিছু বললো না।

প্রবালও চুপ করে রইলো।

পথে ট্র্যাফিক নেই, রাস্তার মাঝখানের ট্র্যাফিক-লাইট নিজের মনে লাল হলদে সবুজ হয়ে জ্বলছে। দূর এসপ্লানেডে আবছা আলোর সারি। বহুদূর জগুবাবুর বাজারের কাছে আকাশের বুকে জ্বলছে আর নিভছে নীল নিওন সাইনে সিগারেটের দ্যুতিময় বিজ্ঞাপন।

চারদিকে তখন ফুটফুটে জ্যোৎস্না। ময়দানের গাছে দু'একটি কাক ভুল করে ডেকে উঠলো। আকাশ বড়ো বেশী শুভ্র-নীল, বড়ো বেশী পরিষ্কার, পুরোনো মধুর দিনের মতো স্নিগ্ধ চাঁদ—আর, এক টুকরো মেঘও নেই কোথাও—।

॥ শেষ ॥